দ্বিতীয় সংস্করণ : ১৯৫৭

প্রকাশক :
ময়ূখ বসু
গ্রন্থপ্রকাশ
১৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

প্রচ্ছদশিল্পী:
শচীন বিশ্বাস

মুদ্রাকর :
পশুপতি দে
শনিরঞ্জন প্রেস
২৭, ইন্দ্র বিশ্বাস রোড
কলিকাতা-৩৭

সুনন্দাকে,
সঙ্গে নিয়ে যাইনি বলে

সব লেখাই, একটি বাদে, 'চাণক্য' ছদ্মনামে "আনন্দবাজার পত্রিকা'য় বেরিয়েছিল। এবং সব ক'টিই, একটি বাদে, তড়িঘড়ি ইউরোপ থেকে পাঠানো। ঘষে-মেজে, একটু অদলবদল করে "অন্য নগর দর্শন" নাম দিয়েই একসঙ্গে ছাপানো হল। নতুন সংস্করণে যোগ করলাম মারকিন দেশ দর্শনের কিছু চিত্র। এই লেখার ব্যাপারে যাঁরা আমাকে উৎসাহ দিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে আছেন 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র সম্পাদক শ্রীঅশোককুমার সরকার ও বার্তা-সম্পাদক শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষ এবং শ্রীভূপেশগোবিন্দ মজুমদার, শ্রীসুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীমনোজ বসু। সকলের কাছেই আমি কৃতজ্ঞ।

লেখক

॥ এক ॥

ফ্রাংকফুর্ট এয়ারপোর্টে নামতেই ঠাস্ ঠাস্ করে গালে দুই চড়। প্রথম চড় কন্‌কনে ঠাণ্ডা হাওয়ার। নর্থ সী থেকে চোলাই হয়ে ধাক্কা মেরেছে আল্পসের গায়ে, সেখান থেকে রিবাউণ্ড মেরে সোজা আমার ডান গালের চামড়ায়।

দ্বিতীয় চড় খানিক পরেই। ট্রানজিট লাউঞ্জের দিকে এগোতেই ভুট্টাদানার মত কতকগুলি ছিটেগুলি দিলে আমার বাঁ গাল এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করে। পাসপোর্ট, হেলথ সার্টিফিকেট দেখিয়ে অলিগলির গোলকধাঁধায় খানিক ঘুর-পাক খেয়ে চলন্ত সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠলুম। বাস্, সেখানে যেতেই এক চীৎকার—Ausgan gludenflugzeugen—একেবারে ফৈয়াজ খাঁ ঘরানায় নাভিমূল থেকে উচ্চারিত মার্গসংগীতি হুংকার এবং এই হুংকারের চড়ে আমার বাঁ দিকের দাঁত কটি খসে পড়ার জোগাড়।

পশ্চিম জার্মানী সরকারের আমন্ত্রণে ওঁদের দেশ সফর করতে এসেছি। গত কয়েক বছর জব চার্ণকের নগর দর্শনের পর গ্যেটে-শীলার-ভাগনার-কাণ্টের দেশ দর্শন। তারপর ইউরোপের অন্যান্য দেশ।

সাতাশে এপ্রিলের সন্ধ্যে। লুফৎহানসার বোয়িং বিমান সেনেটর সুড়ুৎ করে দমদমের আকাশ থেকে পালিয়ে গেল। তারপর এক লাফে করাচী। সেখানে প্রথম সম। আমার পাশের আসনের ভদ্রলোকটি কায়রোর এগ্রিকালচারাল ইঞ্জিনিয়ার, নাম হাসান

আব্বাস, এখানে নেমে গেলেন। এ প্লেন কায়রোতেও থামবে; কিন্তু ভদ্রলোক বিদায় নেবার আগে জানালেন, 'আমার দেশের সার্ভিস করাচী থেকে রয়েছে, অন্য দেশের বিমান কোম্পানীকে অযথা কেন টাকাটা দেব।'

শূন্য স্থান পূর্ণ করলেন এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক। আলাপচারী হতেই জানলুম, তিনি ডক্টর মেহতা, বড়োদা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, আমাদের মতই অন্য একটি আমন্ত্রণে পশ্চিম জার্মানী যাচ্ছেন।

আমরা দলে চারজন। আনন্দবাজারের আমি, কলকাতার অন্য দুটি বাংলা কাগজের দুই প্রতিনিধি এবং ওড়িষ্যার 'কলিঙ্গ' কাগজের সম্পাদক। আমাদের ফার্স্ট ক্লাশে মোট আটাশটি আসনে আমরা ছাড়া বাঙালী আরও দুজন, পেছনে টুরিস্ট ক্লাশের ৮০।৯০ জনের মধ্যেও কয়েকজন রয়েছেন। অর্থাৎ বঙ্গভাষীরাই মেজরিটি। লাউডস্পীকারে জার্মান ভাষার কল-কল-নিনাদ এবং আসনের সামনে Nicht Rauchen (ধূমপান নয়), Bitte anschnallen (কুর্সী পেটি বাঁধিয়ে) ইত্যাদি লেখা থাকলে কী হবে, খাঁটি বাঙালী আবহাওয়াতেই আমরা উড়ে চললুম।

ভেতরে ব্যবস্থাটিও ভারী চমৎকার। ছত্রিশ হাজার ফুট উঁচুতে ঝড়ের বেগের সোঁ সোঁ শব্দ ছাড়া মনেই হয় না আমরা ছুটছি। যেন আরাম কেদারায় হেলান দিয়ে ড্রইংরুমে বসে আছি। দুজন হাওয়াই হোস্টেস ঠোঁটের ডগায় মিষ্টি হাসির লেবেল লাগিয়ে আমাদের খিদমৎগার করতে সদা প্রস্তুত। মিনিটে মিনিটে পানীয় এবং খাবার আসছে। স্যাম্পেন, কনিয়াগ, চকোলেট, সিগারেট, আইসক্রীম—কত কিছু। এটা সেটা প্রেজেন্টও আসছে। একেবারে আমীরি আবহাওয়া। দুই "হাস্যমুখী"—ঢ্যাঙাটি জার্মান, বেঁটেটি ফরমোজাই চীনে—খানিক পরেই নিয়ে আসতে লাগলেন ডিনারের থালি। ড্রইংরুম এক নিমিষে ডাইনিং হল।

খাবারের নামের কত বাহার,—cream of carrot soup, beef saute slrogh off with mush-rooms, buttered noodles, savarin with fruits ইত্যাদি ইত্যাদি।

আমার তখন সক্রেটিসের মত অবস্থা। সক্রেটিস গেছেন এথেন্সের এক মনোহারী দোকানে। নেড়েচেড়ে নানান জিনিস দেখেন আর লুব্ধ দৃষ্টিতে ঘুরে ঘুরে বেড়ান। শিষ্যরা ভাবেন, 'হল তো! গুরুজীর বড় যে নির্লোভ বাতচিত, এবার?'

আধ ঘণ্টা পর সক্রেটিস সখেদে বলে উঠলেন, 'হায় হায়, এত সব সুন্দর জিনিস, কিন্তু একটিতেও যে আমার দরকার নেই।'

আমার অবস্থাও প্রায় তাই। এতো সব চমৎকার চমৎকার খাবার, চর্ব্য-চূষ্য-লেহ্য-পেয়, অথচ কোনটিই আমার চাই না, আমার কাছে সব অখাদ্যি। সব ফেরৎ দিলুম।

হাওয়াই হোস্টেসকে বললুম—'কোন ফলের রস আছে? শরীরটা ভাল নেই, খাব না।' হেলতে দুলতে তিনি নিয়ে এলেন Traubensaft, আঙুরের রস। তাই ঢক্ ঢক্ করে খেলুম। গোমাংস, শূকর-মাংস আমার সইবে না, আর নাড়িভুঁড়ির মত, মাছের পেটের থলথলে জিনিসের মত জট পাকানো ফ্যাকাশে জিনিসগুলো পেটে গেলেই নির্ঘাৎ বমি। আঙুরের রস তার চেয়ে ঢের ভাল।

পার্শিয়ান গাল্‌ফের কোণে সৌদি আরবের ধাহ্‌রান বিমান বন্দরে এলুম আমার ঘড়ির রাত দু'টো দশ মিনিটে। চমৎকার জায়গা। ঝক্‌ঝকে, আলোর মালায় ঝলমল। মাথায় ফেটি বাঁধা আরবের দল ঘুরে বেড়াচ্ছে এদিকে ওদিকে।

ভোর ছ'টায় কায়রো। এতদিন যা ছিল মানচিত্রের এক একটি বিন্দু, আজ সব আমার হাতের মুঠোয়, যন্ত্রের দৌলতে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে আমি হাজির।

কায়রোয় তখন স্থানীয় সময় রাত তিনটে। আকাশে বিমান

উঠতেই নীচে তাকিয়ে দেখি, রহস্যময়ী কায়রো তখনও জেগে আছে। বড় বড় বাড়ি, উঁচু উঁচু মিনার, আলোর চকমকি, রাস্তায় গাড়ির সারি।

নিমিষের মধ্যে আবার সব ফাঁকা, আমরা আবার মেঘের আড়ালে। ঘুমের ভরসায় চোখ বুজলুম। ডাইনিং হল ততক্ষণে বেড রুম। ভূমধ্য সাগরের বুক চিরে আমাদের পুষ্পক রথ তখনও ছুটছে।

রাত্রি এসে যেথায় মেশে দিনের পারাবারে, সেই ঊষা-লগ্নে ইউরোপের সঙ্গে আমার শুভদৃষ্টি। ঘুম ভাঙতেই দেখি মেঘের কুয়াশা ছিঁড়েখুঁড়ে নীচে ভূমধ্য সাগরের নীল জল। এপাশে ওপাশে সাদা মেঘের অসংখ্য স্তর। পেঁজা তুলোর মত, গোটা আকাশে ছড়ানো। এক অদৃশ্য ধুনুরী যেন আপন খেয়াল মত সেই তুলো দিয়ে রকমারি জিনিস ভাঙছে, গড়ছে। মেঘের গায়ে প্লেনের ছায়া একশ মিটারের দৌড় প্রতিযোগিতায় পাশের ট্র্যাকে সেই ছায়া পড়ি-কি-মরি চলেছে, চলেছে, চলেছে। এবং মেঘের ফাঁকে ফাঁকে ওই স্নো নীল সমুদ্রের নিস্তরঙ্গ জলরাশি। নীল আকাশটাকেই যেন কেউ উল্টে রেখে দিয়েছে।

পলক ফেলতে না ফেলতেই সবুজ মাঠ, গাছ-পালা, বাড়ি-ঘর দৃশ্যমান। প্লেন চিলের মত ছোঁ মেরে নামছে নীচে।

হ্যাঁ, এই হল রোম, রূপকথার শহর 'সুন্দরী রোমা'। আমাদের সময় সকাল নটা, কিন্তু রোমে তখন ভোর। রাস্তাঘাট, বাড়িঘর সব পরিষ্কার। রাতের আলো একটি একটি করে নিভছে, পথে লোকজন নেই, গাড়িঘোড়া নেই, সব ঘুমে অচেতন। যেন এক অতিকায় দৈত্যপুরী, মায়াবীর জাদুকাঠির ছোঁয়ায় নিঃসাড়।

রোমে আমরা নামলুম। ট্রানজিট লাউঞ্জে আধঘণ্টার বিশ্রাম। শুধু করাচী থেকে যাঁরা যাঁরা উঠেছেন তাঁরা প্লেনে বন্দী। ইতালিয়ান অফিসার সকলের হেলথ সার্টিফিকেট দেখলেন, ছেড়ে দিলেন, কিন্তু করাচীর যাত্রী?—না, পাদমেকং ন গচ্ছামি, বসন্ত রোগের জুজু তাঁদের হাত পা বেঁধে রেখেছে।

রোমের ট্রানজিট লাউঞ্জ বাহারের, আমাদের দমদম তার কাছে কুঁড়েঘর। যেমন বিরাট, তেমনি সুন্দর। আগাগোড়া কাচে মোড়া, পাঁচখানা ফুটবল মাঠের মত বাড়ি। সিঁড়ি বেয়ে উঠতেই তিনহাত অন্তর অন্তর বসার জায়গা। ঢুকবার, বেরোবার সারি সারি রাস্তা এবং মনোহারি জিনিসের দশ-বারোখানা বিপণি। আমার তখন পাড়াগাঁয়ের সেই পেটুক ব্রাহ্মণের কথা মনে পড়ল। বামুন ঠাকুর এই প্রথম এসেছেন রেল স্টেশনে। লম্বা প্লাটফর্ম দেখেই সঙ্গীকে বললেন, 'কী চমৎকার জায়গা, একসঙ্গে অন্তত পাঁচশ ব্রাহ্মণের ভোজন-ব্যবস্থা এইখানে করা যায়।' গল্পের এই ব্রাহ্মণ-সন্তানটি রোমের ট্রানজিট লাউঞ্জে এলে নির্ঘাৎ বলতেন, 'পাঁচ হাজার ব্রাহ্মণের ভোজন এইখানে সম্ভব।'

ইতালিয়ান পসরায় সাজানো একটি দোকানের দিকে এগোলুম। নয়ন-ভোলানো নানা জিনিস। কিন্তু দাম? ওরে বাপরে, কপালে নয়, ব্রহ্মতালুতে চোখ ওঠার জোগাড়। কলকাতার যেমন লক্ষ্মী-কাটারা, গণেশ কাটারা, এখানেও অনেকটা তাই, সব দোকানেই বসে আছেন 'গলাকাটারা'।

শিল্পী সুনয়নী দেবীর নাতি মিস্টার চ্যাটার্জি আমাদের যাত্রা-সঙ্গী। তিনি বললেন, 'সাবধান মশাই, কিছু কিনবেন না, এক-একটা জিনিসের দাম যা হাঁকবে, তাতে আপনার ট্র্যাভেলার্স চেকখানা এইখানেই গচ্চা দিয়ে যেতে হবে।'

অগত্যা চার পা পিছিয়ে এলুম। এবং সঙ্গে সঙ্গে শুনলুম,

লাউড-স্পীকার বলছে, 'ফ্রাংকফুর্টের যাত্রীরা দয়া করে এবার চলে আসুন।'

আবার যাত্রা শুরু। খানিক পাঁয়তারা কষেই প্লেনের হুংকার এবং রাগে গোঁ গোঁ করতে করতে নিমিষে নিরুদ্দেশ। রোমের বিমানবন্দর আবার মেঘের আড়ালে।

আটাশে এপ্রিল আল্পস পেরিয়ে ফ্রাংকফুর্ট। বোয়িং বিমানের যাত্রা এইখানে শেষ। ঘড়ির কাঁটা প্রায় পাঁচ ঘণ্টা পিছিয়ে দিলুম।

বাসে করে ট্রানজিট লাউঞ্জ। দমকা ঠাণ্ডা হাওয়া আর অনভ্যস্ত জার্মান ভাষার কড়রমড়র অতিকষ্টে সহ্য করে ঘণ্টা দুই পর ফের অন্য ভাইকাউণ্টে চড়ে মিউনিক। সরকারী প্রতিনিধি হের পিটার ভিল অভ্যর্থনার জন্যে ঐ তো সামনে দাঁড়িয়ে।

॥ দুই ॥

মিউনিক শহরে নেমেই মনে হল এখানে মেয়ে এবং পুরুষের সংখ্যা নির্ঘাৎ সমান সমান। যেখানে যাই, যেদিকে তাকাই কেবল যুগল মূর্তি। কখনও রাধাকৃষ্ণ, কখনও হরগৌরী। একজন আর একজনকে বগল-দাবা করে চলেছে।

মারিয়েন প্লাৎস্ বলুন আর নিমফেনবুর্গ শ্লোস্ বলুন সব জায়গায় ঐ এক ছবি। মাক্সমিলিয়ন স্ট্রাসে আর স্টাইনসডোর স্ট্রাসে যেখানে এসে মিলেছে সেইখানে, শহরের বুক চেরা ঈজার নদীর সেই পূব পারে, যে-দুটি বাচ্চা ছেলে দেয়াল ধরে ওপরে ওঠার চেষ্টা করছে তাদের পাশেও দুটি ফুটফুটে মেয়ে।

সুইজারল্যাণ্ড সীমান্তে গারমিশ যাবার পথে সাইকেলের যে সারি ছুটির দিনে হাত ধরাধরি করে আল্পস দেখতে চলেছে, তার বাহনও অর্ধেক তরুণী। লুইজেন স্ট্রাসের নয়নভোলানো উইণ্ডো ডিসপ্লের সামনে লুব্ধ দৃষ্টি নিয়ে যে বৃদ্ধ-বৃদ্ধার দল মিনিটের পর মিনিট তাকিয়ে আছেন, তাঁদের সবাইও জোড়া জোড়া। এ শহরে সবই দেখছি দ্বৈত সঙ্গীত।

তেমনি এখানে স্থান নেই বিশৃঙ্খলার আর অনিয়মের। একেবারে তাসের দেশ। চল নিয়ম মতে, চল সমান পথে। মিউনিকবাসী হাঁটছে, ফিরছে, হাওয়া খাচ্ছে, কাজ করছে এই নিয়মের নিগড়ে নিজেকে বেঁধে।

আমার পশ্চিম ইউরোপ দর্শনের সুরু এই মিউনিক দিয়েই।

ইংরেজী কেতায় আমরা যাকে বলি মিউনিক, জার্মানরা বলে ম্যুনচেন। বাভারিয়ার রাজধানী, নাচ-গান-বাজনা-ছবি আঁকার মক্কা। গ্যাটে থেকে টমাস মান, হাইনে থেকে কেলার—সবাই ম্যুনচেনের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। এখানে না এলে নাকি জার্মানীই দেখা হয় না। মার্কিন লেখক টমাস উয়োলফের ভাষায়—"the city is a great Germanic dream translated into life."

শহরে গ্রামে, নতুনে পুরাতনে এমন মাখামাখি আর কোথাও নেই। গুণীজনদের কেউ এই শহরকে বলেন, জার্মানীর রোম—যেদিকে তাকাও শুধু গির্জে আর গির্জে। কেউ বলেন, নব-এথেন্স,—প্রাচীন গ্রীসের মতই এখানে শিল্পকলার তীর্থক্ষেত্র। কেউ কেউ আবার এখানকার আলো-ঝলমল শ্বাবিং এলাকা দেখে বলেন, এ যে প্যারিসের সোদর-ভাই। আমার যাত্রাসঙ্গী হের ভিল কিন্তু বলেন, আসলে এ শহরের আকর্ষণ তার Gemutlich Keit. অর্থাৎ "the atmosphere of warm and easy friendliness."

সত্যিই তাই। কলকাতার লোক আমি, চোখ ধাঁধাবার মত তেমন কিছু হয়ত নেই, আমাদের শহরের মত গাড়িঘোড়া লোক-জনের ভিড় এখানকার লোকেরা ভাবতেই পারে না, কিন্তু শহরের এমনি গুণ যে, পা দেওয়া মাত্র মনে হয়, এ আমার হয়ে গেছে।

মিউনিক আপনাকে সাদরে বরণ করে নেবেই। হোটেল কাইজারের এগারতলা থেকে দেখা টালির লাল লাল ছাদ, উঁচু উঁচু মিনার, গির্জে আর ফার গাছের সারি হাতছানি দিয়ে ডাকে। নীচে নেমে ভিড়ের মাঝখানে নিজেকে মিলিয়ে দেওয়া ছাড়া তখন আর উপায় থাকে না। দুধের সরের মত বরফের বৃষ্টি এবং কন্‌কনে ঠাণ্ডা হাওয়ার হঠাৎ-ঝাপটা কোন আগন্তুককেই আটকে রাখতে পারবে না, সে বেরিয়ে পড়বেই।

লুইজেন স্ট্রাসে ধরে খানিক এগিয়ে গেলেই ঐ তো কিংস

স্কোয়ার। ডান পাশের ঐ উঁচু বাড়িটার বারান্দা থেকে লক্ষ কণ্ঠে একদিন শোনা যেত 'হাইল হিটলার'। সামনে পূব-উত্তর কোণে যে বাড়িতে এখন গানের ইস্কুল, সেই বাড়ির সদর দরজা দিয়ে ছাতা হাতে একদা বেরিয়ে এসেছিলেন নেভিল চেম্বারলেন, মিউনিক প্যাক্টে সই করে।

ওডিয়ান প্লাৎসে এক চক্কর মেরে আবার যাওয়া যেতে পারে পৃথিবীর সব চেয়ে বড় শিল্পযাত্নঘর ডয়টশে মিউজিয়ামে, কিংবা পিনোকেথেকে, আর্ট গ্যালারিতে। কিংবা ঈজার নদী পার হয়ে বাভারিয়ার স্টেট চান্সেলারি ভবন মাক্সিমিলিনিয়ামে। আর একটু ঘুরলেই ইংলিশ গার্ডেন, ডিয়ার পার্ক, সেণ্ডিলিং গারটোর প্লাৎস্, ন্যাশনাল মিউজিয়াম, ভিট্রেলসবার্থ ফাউণ্টেন, সেণ্ট মাইকেলাস চার্চ, কত কিছু।

চওড়া চওড়া রাস্তা, চওড়া চওড়া ফুটপাত, বোমাবিধ্বস্ত বাড়ির পাশেই মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে উঁচু উঁচু স্কাইস্ক্রেপার। ঝড়ের বেগে ছুটে যাচ্ছে ওয়ারলেস ফিট করা মের্সেডেজ বেনৎস ট্যাক্সি, নীল ট্রামগাড়ী আর হরেক রকমের, হরেক সাইজের মোটর গাড়ি। রাস্তার দু' পাশে যেদিকেই তাকান, শুধু উইণ্ডো ডিসপ্লে। কাঁচে মোড়া ঘরের ভেতরে রকমারি বিপণি, রকমারি মডেল। মডেলের সংখ্যা এত বেশী যে, তাদের গুণলে মিউনিকের লোকসংখ্যা বোধ হয় ছাড়িয়ে যাবে। আলপিন থেকে মোটরকার জুতো থেকে টেলিভিশন সব 'আয় আয়' ডাকছে।

শহর জুড়ে প্রাচীন কালের পাঁচিল, মাঝখানে ঈজার নদী। পাঁচিল ডিঙিয়ে শহর দিন দিন বাড়ছে।

এখানকার প্রসিদ্ধি তার অপেরা আর শিল্পকলার জন্যে। পাগলা রাজা দ্বিতীয় লুডভিগের প্রিয় বন্ধু ভাগনার এই শহরে ছিলেন অনেক দিন। ফুয়েরার হিটলারেরও প্রিয় শহর ছিল

মিউনিক। এখানকার স্টেট থিয়েটারে অপেরা, বাভারিয়ান নাচগান এবং শহরের ভেতরে বাইরে সকাল সন্ধ্যে ঘুরে আমারও মনে হয়েছে সত্যি সত্যিই, এ ভালবাসার জিনিস বটে!

একদিন আল্পস দেখতে গিয়েছিলুম। শহর থেকে মাইল সত্তর দূরে। বরফের স্তূপ ডিঙিয়ে। পথে পড়ল ওবেরামারগাউ নামে এক গ্রাম। এখানে রবীন্দ্রনাথও এসেছিলেন। বোধ হয় ১৯৩০ সালে। এখানকার Passion Play বিখ্যাত। প্রতি দশ বছর অন্তর অভিনীত যীশুখৃষ্টের জীবননাট্য এই Passion Play. খৃষ্টের ভূমিকায় যিনি অভিনয় করেন, তাঁকে সারাজীবন থাকতে হয় নিষ্পাপ, শুভচারী। 'Passion Paly' দেখেই রবীন্দ্রনাথ 'শিশুতীর্থ' কবিতাটি লেখার প্রেরণা পান। এই একটিমাত্র কবিতাই রবীন্দ্রনাথ প্রথমে ইংরাজীতে লেখেন, বাংলায় অনুবাদ করেন পরে।

ওবেরামারগাউ ছাড়িয়ে আল্পসের চূড়োয় লিণ্ডারহফ কাসল। সেই পাগলা রাজা লুডভিগ ১৮৭৯ সনে এটি তৈরী করান।

এখানে বিলাসব্যসনের ছড়াছড়ি। আমাদের গাইড এক একটি জিনিস দেখাচ্ছে আর বলছে, এই যে পোর্সেলিন ভাস, এসেছে জাপান থেকে। এই যে বাতিদান—প্যারিস থেকে। এই যে স্বর্ণময়ূর—ইরান থেকে। আর এই যে দেখছেন হাতির দাঁতের তৈরি বাতিদানটি, এই দুর্গের সবচেয়ে মূল্যবান জিনিস, তৈরি করতে পুরো পাঁচ বছর লেগেছিল।

এমন মূল্যবান জিনিসটি কোথা থেকে এসেছে ছোকরা গাইডটি কিন্তু বলল না। আমি পাল্টা প্রশ্ন করলুম—'ভায়া, হাতির দাঁত কোথাকার?'

বললে—'Possibly from India।' আবার বললুম—'ভবিষ্যতে এই কথাটি উল্লেখ করবেন দয়া করে।'

সঙ্গী মার্কিণ মহিলাটি আমার গায়ের চামড়ার দিকে তাকিয়ে তৎক্ষণাৎ জানতে চাইলেন, 'দেশ কোথায়?'

'ইণ্ডিয়া।'

'তাই বলুন—'

মহিলাটি হাসলেন। আমিও গটগট করে এগিয়ে গেলুম।

॥ তিন ॥

মিউনিক থেকে ট্রেনে চলেছি হোফ্—চেকোশ্লোভাকিয়া ও রুশ-অধিকৃত জার্মানীর সীমান্ত রেল স্টেশন। কলকারখানা, বাড়ি-ঘর একের পর এক ছাড়িয়ে ড্রেসডেনগামী ট্রেন এগিয়ে চলেছে।

দুধারের দৃশ্য আমাদের দেশের মতই। সেই সবুজ মাঠ, মোটরের রাস্তা, টেলিগ্রাফের খুঁটি, ছোট ছোট গাছ। তফাৎ শুধু লোকজনের গায়ের রঙে, পোশাকে আর ছিমছাম চেহারায়।

খানিক এগিয়েই লাণ্ডশুট—বড় স্টেশন। ছ'টি সোফার আরাম খুপরি ছেড়ে ডাইনিং-কারে গিয়ে বসেছি। মেনুকার্ড হাতে বৃদ্ধ ওয়েটার স্বাগত জানাল—'জে হিণ্ড্।'

বলে কী! একি স্বপ্ন, একি মায়া! বিস্ময়ের ঘোর কাটতে না কাটতেই আর একদফা বিস্ময়। ওয়েটার স্মিতহাস্যে বললে—'এজাড্ হিণ্ড্ ঝিণ্ডাবাড্, হোয়াট ডু ইউ ওয়াণ্ট, রোটি, মাকন অ্যাণ্ড—'

এতক্ষণে টের পেলুম, বোধ হয় নেতাজী সুভাষচন্দ্রের পরিচিত কেউ। তৎক্ষণাৎ আলাপচারী হলুম। বললে, তাঁর নাম হের ব্রেনডাল, বাড়ি পূর্ব-জার্মানীর ড্রেসডেনে। সেখানেই আলাপ হয়েছিল 'সুভাষ বোসের' সঙ্গে, ঠিক যুদ্ধের মাঝখানে। আমাদের দেখেই চিনতে পেরেছে, 'চন্দর বোসের' দেশের কেউ!

বিদেশ বিভুঁইয়ে এসে 'জয় হিন্দ' ধ্বনি শোনা এবং নেতাজীর পরিচিত কাউকে হাতের কাছে পাওয়া কতখানি আনন্দের, দেশে

থেকে কল্পনা করা সম্ভব নয়। মিউনিক, ফ্রাংকফুর্টে দু-চারজনকে জিজ্ঞেস করেছিলুম, সুভাষচন্দ্রকে ওরা চেনে কি না। ওরা মুখ-চাওয়াচাওয়ি করেছে, সে আবার কে? দুটি লোক ছাড়া মিউনিকের আর কাউকে 'টাগোরের' নাম বলতে শুনিনি। 'টাগোর' 'বোস' থাক, ভারতবর্ষ সম্পর্কেই ধারণা কম। সাধারণ লোক নয়, ছাত্র এবং যুব-সমাজেও। একটিমাত্র লোককে সবাই জানে, তিনি 'নেহেরু'। 'আচ্ছা, শুনছিলাম, নেহেরু নাকি অসুস্থ, এখন কেমন আছেন তিনি?'—বাস্, ঐ পর্যন্তই।

হোফ্ স্টেশনে নামার পর আর-একদফা আনন্দ। ওভারকোটে গা-মুড়ি দিয়েও পেছনের বারান্দায় শীতে ঠকঠক কাঁপছি। হঠাৎ সামনে এসে দাঁড়াল এক মোটরগাড়ি। গাড়ি থেকে নামলেন এক ভদ্রলোক আর পনের-ষোল বছরের একটি মেয়ে। ভদ্রলোকটি আমাদের দেখে থমকে দাঁড়ালেন, গায়ের চামড়ার দিকে কড়া নজর ফোকাস করতে লাগলেন। 'গুটেন মর্গেন' দিয়ে শুরু করে জানালুম আমরা 'ইণ্ডিয়ান'। ভদ্রলোক লাফিয়ে উঠলেন, চিৎকার পাড়লেন—'হে ইনা, ইণ্ডিয়ান, ইণ্ডিয়ান।'

কী হল রে বাবা, আমাদের রেড ইণ্ডিয়ান ভেবে বাপে-ঝিয়ে লাঠিপেটা করবে নাকি!

ঝাঁকড়া চুলে দোলা লাগিয়ে মেয়েটি সামনে এসে দাঁড়াল। একগাল হেসে ডান হাত বের করে দিল। হাতে একগোছা কাঁচের চুড়ি। এবারে বাঁ হাত। মণিবন্ধে রূপোর একটি গয়না বাঁধা।

বুঝলুম, কোন ভারত-দরদী।

আধা-জার্মান, আধা-ইংরাজী, আধা-বাংলায় এবং পুরো আকারে ইঙ্গিতে জানতে চাইলুম, এসব সে কোথায় পেল।

মেয়েটির নাম ইনগ্রিড স্মিথ। কিছু বলল না। ভদ্রলোক পাল্টা আকারে ইঙ্গিতে যা বোঝালেন, তাতে বুঝলুম কোন মেলা থেকে কিনেছেন। ভারতের জিনিসে তাঁর মেয়ের বরাবর নেকনজর। কেন, তা ঠিক বলতে পারে না। সেই কবে পাঁচ বছর আগে কেনা, রঙ উঠে গেছে, তুগাছি ভেঙেছে, তবু মেয়ে হাত থেকে চুড়ি খুলবে না।

তুজনে চলে গেল। আমরাও গাড়িতে উঠলুম। এখান থেকে যাব জেলব। সুন্দর, ঝকঝকে রাস্তা। গোটা এলাকাই শিল্পাঞ্চল। হোফ্ টেক্সটাইল, মাঝপথে রেহাউ লেদার এবং জেলব পোর্সেলিনের জন্তে বিখ্যাত। লোকবসতি শ্রমিকের; কিন্তু কোথাও অপরিচ্ছন্নতার নামগন্ধ নেই। মনে হবে যেন কোন স্বাস্থ্যনিবাসে এসেছি।

জেলব ছোট শহর, হাজার পঁচিশেক লোকের বাস। চারটে পোর্সেলিন কারখানা সাধারণ লোকের জীবিকার একমাত্র সম্বল। পাহাড়ের কোলে উঁচু-নীচু ছোট রাস্তা, বাংলো প্যাটার্নের বাড়ি, মোটরগাড়ির অবিশ্রাম আনাগোনা। আধুনিক বিলাস-ব্যবস্থায় জেলব আমাদের দেশের পয়লা নম্বরী শহরদের হার মানায়। তবে ঠাণ্ডা দারুণ। স্থানীয় লোকেরা বলেন, জেলব হচ্ছে বাভারিয়ার সাইবেরিয়া, এখানে বছরে ন' মাস শীত, তিন মাস ঠাণ্ডা।

বাভারিয়ার বর্ডার পুলিসের ইন্সপেক্টার হের কোল্‌বের সঙ্গে গেলুম চেক-জার্মানী সীমান্তে। জায়গাটির নাম ভিগুেনমাউ। ওপারে আশ্। আশ্ থেকে প্রাগ ১৮০ কিলোমিটার। সীমান্ত জুড়ে কাঁটাতারের বেড়া। কোল্‌ব বললেন, পাঁচ হাজার ভোল্ট বিদ্যুতে কাঁটা তার সচল, তার ওপর আছে কম্যুনিস্ট পুলিসের কড়া পাহারা। কারও সাধ্যি নেই এপারে আসে।

অন্য দিকে 'এগার' নদী বরাবর আর-একটি সীমান্ত হোহেনবার্গ।

কাছেই শ্রিনভিৎয়ে রেলস্টেশন। সপ্তাহে দুদিন ওয়ারশ-প্রাগ ট্রেন যাতায়াত করে। ট্রেন এবং কিছু মোটরগাড়ির চলাচল ছাড়া দু' তরফে আনাগোনা সম্পূর্ণ বন্ধ। আমি মোটর-রাস্তা ধরে চেকোশ্লোভাকিয়ার ভেতরে দু-পা এগিয়ে গিয়েছিলুম। সামনে বিরাট সাইনবোর্ডে লেখা—Welcome to Socialist Czeckoslovakia.

কোল্‌ব বললেন, যাবেন না, গুলী ছুঁড়তে পারে. ঝোপের আড়ালে রাইফেলধারী সেপাই লুকিয়ে আছে।

ভয় পাইনি, কারণ আমি ভারতীয়।

জেলব থেকে মাইল দশ বার দূরে পূর্ব-জার্মানী সীমান্তেও দেখলুম কড়া পাহারা। কাঁটা তারের উঁচু বেড়া। মোড্‌লারথ নামে এক জায়গায় গিয়ে দেখি, ওপারে লাল ঝাণ্ডা উড়ছে। দু পা যেতে না যেতেই উঁচু পাহারা-চৌকি, বাইনাকুলার লাগিয়ে কম্যুনিস্ট পুলিস দাঁড়িয়ে আছে। এপারেও আছে। বার্লিন বরাবর মোটরের যে রাস্তা গিয়েছে, সেখানকার চৌকীতে ছোকরাবয়সী কয়েকটি পূবদেশী। এপার থেকে চিৎকার পাড়লুম—আফ্‌ভিডার-জেহন। অর্থাৎ কিনা ফির মিলেঙ্গে। কোন মুখবিকার নেই। হাত নেড়ে নেড়ে রুশী ভাষায় ফের বললুম—'দাসভিদানিয়া।'

কোন সাড়া নেই। পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে। গাইডকে জিজ্ঞেস করলুম, 'ওরা রুশী না জার্মান?' গাইড বললেন—জার্মান।

'সালে' নদীর ধারে উনটাফেনগ্রাউ গ্রামে গিয়েও এক অবস্থা। ওপাশে রুশ এলাকায় বড় চামড়ার কারখানা। কারখানার গায়ে পশ্চিম জার্মানীর শাসন-ব্যবস্থাকে বিদ্রূপ করে একটি কার্টুন এবং

কয়েকটি পোস্টার। এখানে চেকপোস্ট নেই। সালে নদীর মাঝামাঝি সীমান্তের সীমানা।

ওপারের জায়গাটির নাম হিরশবার্গ। আমার গাইড হের ভিল ঐ পারে এক নিমেষে অনেকক্ষণ চেয়ে আছেন। হঠাৎ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলেন—জানো, আমার দেশ পড়েছে পূর্ব-জার্মানীতে। জানি না, আর কোনদিন সেখানে যেতে পারব কি না। এখন 'বন'-এ আছি, কিন্তু আমার মন পড়ে আছে দেশের মাটিতে, ওই দূরে, হিরশবার্গ ছাড়িয়ে।

হের ভিলকে আর বললুম না, পূব-বাংলায় আমার দেশ যেখানে সেখানে আমারও আর যাবার উপায় নেই। সে পর হয়ে গেছে।

॥ চার ॥

জার্মানীতে যদি আসেন নুরেমবার্গ ঘুরে যেতে ভুলবেন না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সেই ঢাক-পেটানো ট্রায়ালের সঙ্গে এই শহরের নাম জড়িত বলে নয়, আরও অনেক কারণে।

গ্যোরিং, গ্যোবলস, হিমলার, কাইটেলদের বিচার কোন্ বাড়িতে হয়েছিল, আমার ছোকরা ট্যাক্সি ড্রাইভারটির কাছে জানতে চেয়েছিলুম, সে বলতে পারেনি। বরং বলেছে, 'ওসব নাম মুখে আনবেন না, ওদের আমরা ভুলে যেতে চাই। হিটলার? হ্যাঁ হ্যাঁ, তাকেও। তারই জন্যে তো আমাদের দেশ আজ দু' টুকরো।'

এ কথা শুধু ঐ ট্যাক্সি ড্রাইভারেরই জবান নয়, পশ্চিম জার্মানীর অনেকের। সুতরাং নুরেমবার্গ ট্রায়ালের ইতিহাস আপাতত শিকেয় তুলে আসুন, আমরা গম্বুজে মিনারে আকাশ খান খান করা এই জবর শহর এক পাক ঘুরে আসি। হলপ করে বলতে পারি আপনি ঠকবেন না, আপনার মূল্যবান সময় বাজে খরচের খাতায় তুলে রাখতে হবে না।

নুরেমবার্গে ঢুকলেই মনে হবে প্রাচীন কাহিনী আর ইতিহাস এখানে ম'ম' করছে। গোটা শহরটা যেন এক জাদুঘর, অনেকটা রাজস্থানের উদয়পুরের মত। পিগ্‌নিৎস নদীর পারে দাঁড়িয়ে বিরাট দুর্গপ্রাকারের দিকে তাকালেই আপনার মনে হবে, খোলা তরোয়ালের ঝনৎকার আর ঘোড়ার খুরের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি।

আমারও তাই মনে হয়েছে। বিরাট বিরাট তোরণ, বিরাট

বিরাট দেয়াল শহরটাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে। তারই ফাঁকফুকুর দিয়ে আকছার ছুটে চলেছে হালফ্যাশানের মোটর গাড়ি, সাইকেল, হাজার হাজার মানুষ।

আরও আছে। চারধারে গির্জে আর মূর্তির ছড়াছড়ি। ষোড়শ শতাব্দীর ব্যবসা বাণিজ্যের পয়লা নম্বরী আড্ডা এই নুরেমবার্গ। এখানেই বিশ্ববিশ্রুত ভাস্কর আডাম ক্রাফ্‌ট এবং দিগ্বিজয়ী শিল্পী আলব্রেষ্‌ট ড্যুরারের বাড়ি। জার্মানীর প্রথম রেলগাড়ি চলেছিল এই নুরেমবার্গে এবং এখানেই পকেট ঘড়ির (যার চলতি নাম 'নুরেমবার্গের ডিম') আবিষ্কর্তা পিটার হেনেলাইন দীর্ঘকাল কাটিয়ে গেছেন।

নুরেমবার্গবাসীর এই শহর নিয়ে গর্বের অন্ত নেই। আমার বুড়ি গাইড 'ডাংকেশ্যোন' আর 'বিটেশ্যোন'-এর এন্তার ফোড়ন দিয়ে ভাঙা ইংরেজীতে জানালেন, 'শুধু পুরোনো কথা পাড়ছো কেন বাপু, নতুন জিনিস কি আমাদের শহরে নেই? এই তো দেখ না, দুর্গপ্রাকারের ঐ পাশটাতে শহরটা কেমন ডবকা ছুঁড়ির মত গায়ে গতরে বাড়ছে। গ্রুণ্ডিগের টেলিভিশন আর ট্রানজিস্টার তৈরীর বড় কারখানাটি কোথায়? এইখানে। তাছাড়া আছে মোটর গাড়ি, খেলনা, বিজলী সরঞ্জাম, কাগজ আর পেন্সিলের শত শত কারখানা। আমরা কম কিসে! নতুনে পুরাতনে এমন মাখামাখি আর কোথাও পাবে না, বুঝলে?'

এই ধরণের গাইডের কথা আপনার না শুনলেও চলবে। ঐসব কলকারখানা জার্মানীর আরও অনেক শহরে গাঁয়ে আপনি দেখতে পাবেন; কিন্তু নুরেমবার্গে আর যা আছে, তা অন্য জায়গায় মোটেই পাবেন না। তাই, অনুরোধ করি, সটান আপনি দেয়ালের ভেতরে ঝাঁপিয়ে পড়ুন। তবে হ্যাঁ, এ কিন্তু অভিমন্যুর ব্যূহ, একবার ঢুকলে বেরোবার সাধ্যি নেই, আপনাকে সাবধানে পা ফেলে

এগোতে হবে—যাতে মধ্যযুগের আবহাওয়া থেকে আবার ছিটকে ফিরে আসতে পারেন এক নিমিষে।

আপনার হাতে সময় কম। সকালবেলার নাস্তাটি সেরে ওভার-কোট চাপিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ুন। হাঁটতে থাকুন দুর্গের দেয়াল ধরে ধরে। হোলি রোমান এম্পায়ারের রাজারাজড়াদের তৈরী এই দত্যিমার্কা দুর্গদেয়াল, তার মিনার, তার ফটক বোমার গোত্তা খেয়ে এখনও টিকে আছে। যা নষ্ট হয়েছিল, তাও আবার বেমালুম ঠিকঠাক।

সামনেই ক্যোনিং স্ট্রাসে। হাল-কায়দার দোকানপাটের মাঝখানে ঐতো উঁকি মারছে চোখা চোখা দুটো গথিক গির্জে—সেণ্ট ক্লারা আর মার্থা। তার কাছেই পঞ্চদশ শতাব্দীতে তৈরী "মাউথহাল"—সে যুগের শস্যাগার। আর একটু এগোলেই আর একখানা এমন ডাকসাইটে গির্জে আপনার চোখে পড়বে, যার কাছে আর সব কিছুই নয়। তার নাম সেণ্ট লরেন্স চার্চ—আডাম ক্রাফ্‌টের ভাস্কর্যের ঐশ্বর্যে ঝলমল। এই গির্জের উত্তরে টিউগেনৃড্‌ব্রুনেন, ষোড়শ শতাব্দীর তৈরী। তারই উল্টোদিকে চতুর্দশ শতাব্দীর নাসাউয়ের হাউস।

এবারে সোজা কারোলিনেন স্ট্রাসে বরাবর আপনার যাত্রা। পিটার হেনেলাইনের ব্রোঞ্জ মূর্তি ছাড়িয়ে দেখতে পাবেন বিরাট সাদা মিনার—ভাইসেটুর্ম, সেণ্ট জেমস চার্চ, কবরখানা, স্পিটলার-টোর, পিগনিৎস পুল। ততক্ষণে আপনি কার্ল গ্রিলেনবার্গার স্ট্রাসের পথ ধরেছেন। আপনার বাঁ পাশে সে যুগের মদের ভাঁড়ার (এখন ছাত্রাবাস), সেণ্ট সেবালডুজ চার্চ, এবং সেই অতিকায় দুর্গের ঘুরপাক। কাছেই আলব্রেষ্‌ট ড্যুরারের বাড়ি।

বাড়ির ভেতরে আপনি ঢুকতে পারেন। বাইরে দরজার কাছে ঘন্টি মারলেই দরজা আপসে খুলে যাবে। দোতলা, তেতলায়

ড্যুরারের আঁকা এচিং আর তেলরঙের ছবির সারি। ১৫০৯ সন থেকে ১৫২৮ সন আমৃত্যু তিনি এই বাড়িতে কাটিয়েছেন। বোমায় বাড়ি ভেঙে যায়, যুদ্ধের পর সারিয়ে এখন যে-কে-সেই।

ইতিমধ্যে কখন দুর্গের ভেতর ঢুকে পড়েছেন আপনি টেরও পাবেন না। সেখানে ঝাড়া আধঘণ্টার ঘোরাফেরা। চেহারা আমাদের দেশের দুর্গের মতই অনেকটা, তবে আরও সাজানো গোছানো, আরও ঝকঝকে।

বুর্গ স্ট্রাসে ধরে আবার উৎরাই। সেখানে রেঁনেসা যুগের চকমিলানো প্যাট্রিসিয়ান ম্যানসন, ফেমবো হাউস, অ্যাপেলো ফাউন্টেন, টাউন হল, গুজমেন ফাউন্টেন এবং অবশেষে হাউপ্ট মার্কেটের ভেতরে চার্চ অব আওয়ার লেডি, দি বিউটিফুল ফাউন্টেন।

সোনায় মোড়া ফোয়ারা, বাজারের ফল ফুল আর আলু-ডিমের পসরাওয়ালীদের মেদাধিক্য প্রতিযোগিতা লক্ষ্য করতে করতে হঠাৎ আকাশ থেকে 'ঢং'।

না, ভোজবাজি নয়, আপনার ঘড়িতে তখন দুপুর বারটা। ঘণ্টা বাজতে শুরু করেছে সামনের ঐ চার্চ অব আওয়ার লেডি থেকে। তার চূড়োয় আছে মানিকিন্‌স্ রান, যার অন্য নাম মাএনলাইনলাউফেন, অর্থাৎ কিনা যন্ত্র ঘড়ি।

এই আজব ঘড়ির বয়স পাকা সাড়ে চারশ বছর। এখনও প্রতিদিন ঠিক বারটায় 'থর্ন টু থর্ন' বাজে। ওপরে প্রবল প্রতাপান্বিত মহারাজ চতুর্থ চার্লস বাহাদুর সিংহাসনে বসে।

দু পাশের নকিব মঙ্গলধ্বনি করে উঠল, ওপরে দাঁড়ানো দুই ঢাকী কাড়ানাকড়া বাজাতে লাগল, কাঁসর ঘণ্টার ঝনর ঝনর আওয়াজ চলল সর্বক্ষণ। ওদিক ডান দিকের দরজাটা হঠাৎ চিচিং ফাঁক। সাত সামন্ত একে একে বেরিয়ে এসে মহারাজ বাহাদুরকে সেলাম জানিয়ে বাঁ দিকের দরজা দিয়ে মিলিয়ে গেলেন। এইভাবে তিনবার।

এদিকে আর সময় নেই। আপনাকে আবার ছুটতে হবে তিন চারটে জাতীয় জাতুঘরে, সেন্ট রোকাস কবরখানায়। যখন ফিরে এলেন, খিদেয় আপনার নাড়ি চোঁ চোঁ করছে। কাছে পিঠের কোন রেস্তোরাঁয় ঢুকে আঙুরের রস, আলু সেদ্ধ, কমলালেবুর রস আর ডিমের ওমলেট খেয়ে চেয়ারে হেলান দিন। সাবধান, ইণ্ডিয়ান রাইস-কারি কস্মিনকালে অর্ডার দেবেন না। চিকেন কারি আর পাটনা রাইস নামে যে বস্তুটি আছে, তা অখাদ্যি—কলা, কমলা, আনারস, ভিনিগার, ক্রীম, মাংসের টুকরোয় এবং আঠা আঠা চালে দলা-পাকানো এক কিম্ভূত জিনিস। নামে প্রলুব্ধ হলে নির্ঘাৎ মারা পড়বেন।

বলতে লজ্জা নেই, আমিও মারা পড়েছিলুম।

॥ পাঁচ ॥

ইআকিম স্ট্রাসে আর কুরফ্যুরস্টেনডাম্ যেখানে এসে মাথা ঠোকাঠুকি করেছে, সেই জংশন ইস্টিশানে দাঁড়িয়ে আছি, আর কলকাতার 'কাঠবাঙাল' সেজে লোকের গিসগিস্, গাড়ির ছুটোছুটি দেখছি। হঠাৎ গোড়ালির কাছটায় যেন কী? লাফ মারতেই 'খ্যাঁক'। একসঙ্গে ডবল 'খ্যাঁক'।

বেতমিজস্য বেতমিজ, রাসকেলস্য রাসকেল এক কুকুরের বাচ্চার লেজ মাড়িয়ে দিয়েছি। আর যায় কোথায়! কুকুরটা তো খ্যাঁক করে উঠলই, শেকলধারিণী 'ব্লন্দিনী'ও খেঁকিয়ে উঠলেন। আদুরে নাড়ুগোপালকে কোলে তুলে কট্টর জার্মাণ-ভাষায় গাঁক গাঁক করে তিনি যা বললেন, তার বিন্দুবিসর্গও বুঝলুম না, কিন্তু মনে হল মা-লক্ষ্মী বলতে চান, 'ওরে মুখপোড়া, চোখের মাথা খেয়েছিস নাকি, দেখতে পাসনি আমি কুকুর নিয়ে হাওয়া খেতে বেরিয়েছি!'

ওভারকোটের তলায় কেন্নোর মত গুটিয়ে এমন কাঁচুমাচু তাকালুম, সারমেয়বিলাসিনী টের পেলেন, 'বাঙাল' গোস্তাকি মাপ কর্বার জন্য কাতর অনুনয় জানাচ্ছে। তিনি গটমট করে ছুটে এগোলেন, আমিও হাঁপ ছেড়ে বাঁচলুম।

গল্প শুনেছিলুম, বার্লিনের যে কোন রাস্তায় দাঁড়িয়ে ঢিল ছুঁড়লে হয় কুকুর, নয় কোন ডক্টরেটের গায়ে নাকি লাগবেই। আজকাল আমাদের দেশেও ডক্টরেট ডিগ্রিধারী আকছার, যেদেশে ঘোড়ার জন্যেও ডক্টরেট দাবি করা হয়, সেই বার্লিনে তো থাকবেই।

কিন্তু এত কুকুর !

তা এই ব্যাপারে বার্লিন আমাদের কলকাতাকেও ছাড়িয়ে যায়। খবর নিয়ে জেনেছি, লাইসেন্সওলা কুকুরের সংখ্যা এই শহরে ৯৭৮০৩। অর্থাৎ গড়ে প্রতি বাইশ জনে একটি করে কুকুর। বিসমার্ক স্ট্রাসে ধরে বা কাণ্ট স্ট্রাসে ধরেই হাঁটুন কিংবা গত যুদ্ধের একমাত্র স্মৃতিচিহ্ন বোমাবিধ্বস্ত ভিলহেল্‌ম্ চার্চের কিনারে দাঁড়িয়ে কারও জন্যে অপেক্ষা করুন, হাজার হাজার লোক আর মোটর-গাড়ির ভিড়ে কুকুরের মিছিলও আপনার নজরে পড়বে। শিকলধারী প্রায় সকলেই মহিলা—তরুণী, প্রৌঢ়া, বৃদ্ধা। একহাতে পুরুষ সঙ্গীকে বগলদাবা করে এবং আর হাতে ঐ শিকল আঁকড়ে হনহন ছুটে চলেছেন ; এইভাবে দু' হাত আটক রেখে জার্মানরা এত কাজ করে কী করে ভেবে আশ্চর্য হই।

আমাদের সনাতন বাঙালীদেরও অবশ্যি দুহাত আটক। একহাতে ধুতির কোঁচা, আর হাতে ছাতা। কিন্তু আমাদের অবস্থা বিপরীত, নিধিরাম সর্দারের ছোটভাইয়ের মত। অর্থাৎ কিনা একহাতে ঢাল, আর হাতে তরোয়াল, লড়াই করব কী দিয়ে ?

কিন্তু এই জার্মানরা ? এদের ময়দানবী শক্তি দেখে তাজ্জব বনে গেছি। যেখানেই যাচ্ছি, দেখছি লাখ লাখ তাজী ঘোড়াকে। যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি সারিয়ে দুর্বার বেগে ছুটছে। পশ্চিম বার্লিনে এসে বিশ্বাসই হয় না, বোমার আঘাতে এ শহর মাত্র কিছুদিন আগে ছারখার হয়ে গিয়েছিল, একখানা বাড়িও আস্ত ছিল না। ফুটবল মাঠের মত চওড়া চওড়া রাস্তা, নতুন নতুন বাড়ি, নতুন বাগান, নতুন বিশ্ববিদ্যালয়—সব নতুন। এখানে এসেই প্রথম মনে হল, জাঁকজমক আর চেকনাইয়ে আমার কল্পনাও হার মেনেছে। চৌরঙ্গীর রাস্তা সমান ইয়া বড় বড় ফুটপাত, দু পা যেতে না যেতেই পথ-আগলানো

কাঁচেমোড়া রেস্তোরাঁ, রকমারি নয়নলোভন বেসাতি এবং দুচোখকে খাটিয়ে মারার নানারকম ফন্দিফিকির। বার্লিন নতুন আগন্তুককে পাগলা করে ছেড়ে দেয়।

পশ্চিম বার্লিনীদের মনে কিন্তু সুখ নেই। ১৯৬১ সালের ১৩ই আগস্ট থেকে তারা ছাব্বিশ মাইল লম্বা দেয়াল আর কাঁটাতারের ঘেরাটোপে বন্দী। এই বেড়া তারা ভাঙতে চায়। বাইশ লাখ গলা এক সঙ্গে আওয়াজ তুলছে—"মাখট ডাস্ টোর আউফ।"— খোল, ঐ দরজা খোল। আমার ঠাকুমা, আমার ছোটবোন, আমার বুড়ো বাপ ঐখানে ঐ কাঁটাতারের বেড়াজালে আটক পড়ে আছে, তাদের আসতে দাও।

তা হবার উপায় নেই। বার্লিন আজ ঠাণ্ডা লড়াইয়ের আড্ডাখানা, তাকে নিয়ে দুই শক্তির 'টাগ-অব-ওয়ার' চলেছে।

বার্লিনে এসে গণ্যমান্য যাঁদের সঙ্গেই আলাপ করেছি সকলেই বলেছেন,—'এই আনন্দ, এই বৈভব সব মিথ্যে। যতদিন ঐ বেড়া উপড়ে ফেলা না হচ্ছে, ততদিন আমাদের কারও মনে স্বস্তি নেই।' হিটলারের হাতে গড়া ১৯৩৬ সনের অলিম্পিক স্টেডিয়ামে যাবার পথে ব্রিটিশ সেক্টরের একটি পার্কে দেখেছি উঁচু বেদির ওপরে অনির্বাণ অগ্নিশিখা জ্বলছে। জার্মান-বন্ধুটি বললেন, দুই বার্লিন আর দুই জার্মানী এক না হওয়া পর্যন্ত এই আগুন জ্বলবে।

ব্রাণ্ডেনবুর্গ ফটকের এপারে দাঁড়িয়ে পুব বার্লিনকেও দেখেছি। আমার গাইড বলেছেন, সেখানে বিভীষিকার রাজত্ব। তা কতখানি সত্যি আমি জানিনে। নিজে ভাল করে সব না দেখে পরের কথা মেনে নেওয়া আমার পক্ষে শক্ত। কিন্তু সীমান্ত প্রহরীর কড়া নজর এড়িয়ে দূর থেকে যতটুকু দেখেছি, মনে হয়েছে নিস্তব্ধ, নিঃসাড়।

বারনাউসের স্ট্রাসের এ ফুটপাত পশ্চিমের, ঐ ফুটপাত পূবের। এতদিন যাতায়াত ছিল, আজ ঐ ফুটপাতের গায়ে গায়েই উঁচু দেয়াল, কাঁটা তার এবং অজস্র রাইফেলধারী। দেয়াল ঘেঁষা সব বাড়ির দরজা জানালা ইটের গাঁথুনিতে পাকাপাকি বন্ধ। লাফ দিয়ে এপারে ঝাঁপিয়ে পড়ার রাস্তাও নেই। এপারে বাইনাকুলার হাতে কয়েকজন ওপারের তিনতলা চারতলা বাড়ির দু একটি মুখ খুঁজছেন। বোধ হয় আপন জন।

বড় করুণ দৃশ্য, বেশীক্ষণ দেখা যায় না। তার চেয়ে ঢের ভাল পশ্চিম বার্লিনের রাস্তায় রাস্তায় গিয়ে ঘোরা কিংবা হোটেল-আম-জু'র লাউঞ্জে বসে কুরফ্যুরস্টেনডামের ছলাকলা দেখা।

হোটেলে পেঁ ছিতেই দেখি দুই বাঙালী ছাত্র অপেক্ষা করছেন। সন্তোষ ব্রহ্ম এবং রঞ্জন পিটার্স। সঙ্গে জার্মান-তরুণী ফ্রলাইন স্টোলপে। সকলেই পরিচিত। তৎক্ষণাৎ কফির অর্ডার এবং আড্ডায় আত্মসমর্পণ।

নীচে হোটেল কাউন্টারে অবিরাম লোকের আনাগোনা, দোতলার লাউঞ্জের ঐ কোণটায় ইতালিয়ান পোশাক-মডেলের ভিড়, পাশের টেবিলটায় এক বুড়ো আপন মনে সান্ধ্যকাগজ 'আবেণ্ড-পোস্ট' পড়ে চলেছেন, অ্যাশট্রেতে চুরুট জ্বলছে আর এই টেবিলে স্টোলপের প্রতিবাদ সত্ত্বেও আমরা কজন বাঙালী খাস বাংলাভাষায় আবোল-তাবোল বকে চলেছি।

কথার ফাঁকে রঞ্জন পিটার্স হঠাৎ গুনগুন করে উঠলেন, 'মধুগন্ধে ভরা'—। খাসা গলা।

এবং কী আশ্চর্য, হঠাৎ মনে পড়ে গেল আজ ২৫শে বৈশাখ, আমাদের কলকাতায় আজ উৎসব। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীতে

লোকের ভিড়, পার্কে বাড়িতে রজনী-গন্ধা আর ধূপের ধোঁয়ার সৌরভ। সারাদিন কেমন করে ভুলে ছিলাম?

বললুম, 'আজ এই টেবিলেই আমরা রবীন্দ্রজন্মোৎসব করব, পিটার্স গান ধরুন। আর ব্রহ্মভাই তুমিও। তোমার গলাও খাসা।'

তুই প্রবাসীরই আপত্তি: 'না, না, পাশের টেবিলের লোকেরা কী মনে করবে।'

আমি কোন আপত্তি শুনব না। দৌড়ে ঘর থেকে নিয়ে এলুম রবীন্দ্রনাথের ছবি। ফুলদানির টিউলিপ ফুলের গায়ে ছবিকে দাঁড় করালুম।

ততক্ষণে রঞ্জন এবং সন্তোষ দুজনেই গলা খুলে গান ধরেছেন, 'এসো আমার ঘরে এসো'—।

যাত্রাসঙ্গী অন্য সাংবাদিক বন্ধুটিও আর পারলেন না, গান শেষ হতে না হতেই আবৃত্তি সুরু করে দিলেন: 'যখন রব না আমি এ মর্ত্যকায়ায় তখন স্মরিতে যদি হয় মন'—

ইতালিয়ান মডেল এমিলিও শুবার্থ আর তাঁর সঙ্গিনীরা ওদিকে উঁকি মারছেন, পাশের টেবিলের বুড়ো ভদ্রলোক অবাক্ বিস্ময়ে তাকিয়ে আছেন, কিন্তু আমাদের টেবিলে তখন সিগারেটের ধোঁয়াও যেন হঠাৎ কেমন সুরভিত হয়ে উঠেছে, টিউলিপ হাসছে।

কারণ কুরফ্যুরস্টেনডামে আজ পঁচিশে বৈশাখ।

॥ ছয় ॥

পূর্ব বার্লিন দেখে ফিরে আসতেই বন্ধুরা জিজ্ঞেস করলেন, কেমন দেখলে ?

বলা মুশকিল। ছিলুম মাত্র কয়েক ঘণ্টা, সেখানকার জীবনের সঙ্গে ভালভাবে পরিচিত হইনি, কী জবাব দিই। শুধু বললুম, 'ইউরোপে এসে এই একমাত্র শহর পেলুম, যার মাঝ রাস্তা দিয়ে নির্বিবাদে হাঁটা যায়।'

প্রশ্নকর্তারা আমার জবাব শুনে হাসলেন, মনে হল খুশীই হয়েছেন। কিন্তু আমি নিজে এখনও ঠিক বলতে পারি না সেটাই গোটা পূর্ব বার্লিনের বা রুশ-অধিকৃত জার্মানীর পরিপূর্ণ ছবি কিনা। তবে বাইরে থেকে দেখাই যদি যাচাইয়ের একমাত্র উপায় হয়, তাহলে বলব, আমার সেই জবাবে বিন্দুমাত্র অত্যুক্তি ছিল না।

কী দেখেছি দেয়ালের এবং কাঁটাতারের ওপারে ? দেখেছি সান্ধ্য আইন জারী করা এক মৃত শহর। ভাঙা-ভাঙা বাড়ি, বোমার আঘাতে ক্ষতবিক্ষত, সারাইয়ের চেষ্টা নেই, পথে গাড়ি-ঘোড়া আছে কিনা টেলিস্কোপ মাইক্রোস্কোপ এক সঙ্গে লাগিয়ে দেখতে হয় এবং পথে হঠাৎ কোন লোক দেখলে 'ইউরেকা' বলে চেঁচাতে মন চায়। যৌবনলাবণ্যরসে উচ্ছল পশ্চিম বার্লিনের পাশে বড় করুণ, বড় বেদনাদায়ক এই ছবি।

ফ্রিডরিষ্‌ স্ট্রাসে বরাবর এগিয়েই চেকপয়েণ্ট চার্লি। এখানেই মার্কিন এলাকার শেষ সীমানা। তারপরেই অন্য জগৎ। আমি

ভারতীয়, পূর্ব বার্লিনের চেকপয়েন্ট পেরোতে কোন অসুবিধে হয়নি ; বন্ধুত্বসুলভ ব্যবহারই পেয়েছি।

কিন্তু কী করে শহরটা দেখি ? কম্যুনিস্ট পুলিসকে ট্যাক্সির কথা জিজ্ঞেস করতেই তারা কাঁধ নাচাল। খালি গায়ে দুই মজুর রাস্তা সাফাই করছে, তাদের আকারে ইঙ্গিতে বোঝালুম, 'ট্যাক্সি চাই।' কোন আশার বাণী পাওয়া গেল না।

জনশূন্য পথ ধরে আপন মনেই তাই হেঁটে গিয়েছি। রাস্তায় রাস্তায় বাড়িতে বাড়িতে শুধু পতাকা আর পতাকা। স্টেট অপেরার পাশ দিয়ে এগিয়ে আলেকজাণ্ডার প্লাৎস্। দু'চারজন লোকের মুখ দেখলুম ; কিন্তু না, ট্যাক্সি কোথাও নেই।

ঝাড়া এক ঘণ্টা খোঁজাখুঁজির পর এক গলির মোড়ে ট্যাক্সির সন্ধান পাওয়া গেল। ড্রাইভার সহৃদয়, তবে চেহারায় মালুম ট্যাক্সিখানা মহারাণী ভিক্টোরিয়ার আমলের।

ফাঁকা রাস্তা দিয়ে উন্টার ডেন লিণ্ডেন—সোজা ঠেকেছে ব্রাণ্ডেনবুর্গ ফটকের পায়। এপাশে ওপাশে কড়া পাহারা। ঐ তো পরিষ্কার দেখা যায় পশ্চিম বার্লিনের চওড়া রাস্তা, হরিণ-কানন, রাইষ স্টাগ. গাড়ির মিছিল। মাত্র দু'দিন আগে ওপার থেকে দেখেছিলুম ঐ একই জায়গার চেহারা, দেখেছিলুম দূর থেকে পূর্ব বার্লিনকে।

আর আজ ? দুদিন আগে ফেলে আসা আমি আর আমার জগৎকে নতুন এক আমি দেখছে। দৃষ্টিভঙ্গীতে কত তফাৎ। মোটর হাঁকিয়ে নিজে যখন ছুটি, পথচারীদের করুণার দৃষ্টিতে দেখি। আবার পরমুহূর্তে পথচারী সেজে দ্রুত ধাবমান অন্য মোটর গাড়ির দিকে সেই আমিই ঈর্ষার কটাক্ষ হানি। দুই সত্তায় কত তফাৎ।

এও অনেকটা তেমনি। আমি নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের নাগরিক,

আমার দৃষ্টিতে দুই-ই সমান। কিন্তু জানি না, বার্লিনের পটভূমিকায় ঐ দুই আমি সত্যি সত্যি সমান কিনা।

রুশ দূতাবাস এবং বহু মনীষীর স্মৃতিপূত বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়িয়ে স্ট্যালিন আলে,—থুড়ি কার্ল মার্ক্স এবং ফ্রাংকফুর্টার আলে। রাস্তাটির নতুন নামকরণ হয়েছে। এই একমাত্র রাস্তা পেলুম, যেখানে গাড়িঘোড়া লোকজনের কিছু আনাগোনা নজরে পড়ে। ড্রাইভার জানাল, এই তো এই জায়গায় কিছুদিন আগে স্ট্যালিনের মূর্তি ছিল, এখন স্ট্যালিন 'কাপুট'—অর্থাৎ কিনা 'খতম'।

খানিক ঘুরে আবার সেই তৃষিত মরুভূমির চেহারা। মিলিটারি গাড়ি দু'চারখানা দেখা যায়, লোকজন কোথাও না। আর এখানে নয়, 'ড্রাইভার, চল ওআর মেমোরিয়েলে।'

হ্যাঁ, ওআর মেমোরিয়েল দেখার মত জায়গা বটে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে নিহত রুশ সৈন্যের স্মৃতিতে তৈরী হয়েছে এই পবিত্র তীর্থভূমি। এবং দেখলুম, পপলার আর ফার গাছের বীথি দিয়ে শত শত লোক চলেছে শহীদ স্মৃতিবেদীতে মাল্যার্ঘ্য নিবেদন করতে। ছেলে-বুড়ো, তরুণ-তরুণী সবাই। এবং এরা গত মহাযুদ্ধে রুশ সৈন্যের কাছে পরাজিত পুব দেশের অধিবাসী জার্মান।

বিরাট চত্বর জুড়ে শ্বেতপাথরের গায়ে খোদাই করা মহাযুদ্ধের ছবি এবং রুশী ও জার্মান ভাষায় 'মহামতি' স্ট্যালিনের বাণী। এই ওআর মেমোরিয়েলের প্রস্তরফলক থেকে স্ট্যালিন এখনও উচ্ছেদ হননি।

দু' পা এগোলেই ব্রোঞ্জের ওপর খোদাই করা এক দীর্ঘকায় সুবিশাল মূর্তি। মাদার রাশিয়া। তার এক হাতে শিশু, অন্য হাতে তরবারি। বরাভয় দিয়ে সে শিশুকে আঁকড়ে ধরেছে, তরবারী দিয়ে দু টুকরো করে ফেলেছে নাৎসী জার্মানীর প্রতীক স্বস্তিকাকে। মূর্তির ভারী বুটের আঘাতে চুরমার হয়ে যাচ্ছে ঐ একই স্বস্তিকা।

শিল্পীর অপূর্ব ভাস্কর্যকলা দেখে স্তম্ভিত হতে হয়। তেমনি স্তম্ভিত হতে হয় পূর্ব জার্মানীর নাগরিকদের দলে দলে এই স্মৃতিবেদীতে আসার আগ্রহ দেখে। কিন্তু আমি জানতে চাই, এই যাদের আজ দেখছি তারা কি নিজের মনের তাগিদেই এখানে ফুল ছড়িয়ে দিতে এসেছে ?

ইংরেজী অল্পস্বল্প জানেন, এমন একজনকে খুঁজে বের করে জিজ্ঞেস করলুম, আজ এত ভিড় কেন, এখানে কিসের উৎসব ?

ভদ্রলোক বললেন, আজ মুক্তির দিন

'কিসের মুক্তি, কার হাত থেকে মুক্তি ?'

ভদ্রলোক এক নিঃশ্বাসে বলে গেলেন, 'আজ এই তারিখেই জার্মানী আত্মসমর্পণ করে, নাৎসীবাদের হাত থেকে এই দিনটিতেই আমরা মুক্তি পাই।'

ভদ্রলোকের কথা যদি আন্তরিক হয়, যদি তোতা পাখির বুলি না হয়, তাহলে বলব, পূর্ব জার্মানীর নতুন জন্ম হয়েছে, অতীতকে অস্বীকার করে আর এক বিশ্বাসকে সে আঁকড়ে ধরেছে।

নাৎসীবাদকে পশ্চিম জার্মানীও তো অস্বীকার করছে, হিটলারের নাম তাদের ইতিহাস থেকে মুছে ফেলে দিতে চাইছে। তাঁদের অনেকে বলেছেন, হিটলার যুদ্ধের ভেতর দিয়ে সর্বনাশ ডেকে এনেছিলেন, পশ্চিম জার্মানী এই সর্বনাশের পুনরাবৃত্তি চায় না। পূর্ব জার্মানীর মনের কথাও তাই। তবে কেন "twin shall never meet ?"

॥ সাত ॥

দুই বদ্ধ কালার পথে দেখা। একজন আর একজনকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এই যে শ্যামবাবু, বেড়াতে নাকি?'

'মোটেই না, মোটেই না, এই একটু বেড়াতে যাচ্ছি'—অন্য-জনের উত্তর।

তৎক্ষণাৎ প্রথমজন ফোকলা দাঁত বের করে হাসলেন, বললেন—'ও, তাই বলুন, আমি ভাবলুম আপনি বুঝি বেড়াতে যাচ্ছেন।'

হামবুর্গ শহরে এসে আমিও ঐ জাতের কালা বনে গেছি। যাব এলব্-টানেল, ট্যাক্সিওয়ালি যা বলেন, আর আমি যা বলি, দুটোয় মিল খুঁজে পাই না। মিনিট পনেরো কথা চালাচালির পর দেখা গেল, এলব্-টানেল নিয়ে যাবেন কি না, সেই কথাটাই ফ্রলাইন আমার কাছে জানতে চাইছেন।

দেখুন তো, ভাষা না বোঝার কী মহা মুশকিল! এদিকে ট্যাক্সি-মিটার গড়-গড় করে দু-দুটো মার্ক (জার্মান মুদ্রা) গ্রাস করে বসে আছে।

যাই হোক, ঝড়ের বেগে এলব্-টানেল, এলব্ নদীর তলার সুড়ঙ্গে—ছোটবেলায় পড়া পৃথিবীর অন্যতম আশ্চর্যে। 'এদিক এলব্ ওদিক এলব্ মধ্যিখানে পথ, তারই ভেতর চলছে মানুষ, গাড়ি-ঘোড়া-রথ।' একেবারে আজব কারবার। লিফট্ এক নিমিষে নিয়ে গেল পাতালে, তারপর লম্বা রাস্তা। ওপরে জাহাজ, মাঝি-

মাল্লার ভিড় আর তলা দিয়ে আমরা নদীর ওপারে গিয়ে হাজির।

হামবুর্গ শহরে এমনি অনেক আজব জিনিস আছে—তাক লাগানো হাগেনবেক চিড়িয়াখানা, আলস্টার লেক, বিসমার্ক মেমোরিয়াল, ডাকসাইটে শিপইয়ার্ড। হামবুর্গ জার্মানীর দু' নম্বর শহর, ইউরোপের পয়লা সারির বন্দর, ব্যবসা-বাণিজ্যের কাশী-মক্কা। অনেকটা মিল খুঁজে পাই আমাদের কলকাতার সঙ্গে। সেই ব্যস্ততা, সেই ভিড়, খিদিরপুর ডকের সঙ্গে আদল, ঢাকুরিয়া লেকের সঙ্গে আলস্টারের মিল। হামবুর্গ বেশী ছিমছাম, এই যা তফাৎ।

হামবুর্গের গৌরব কিন্তু শুধু ব্যবসা-বাণিজ্যে নয়, অন্যখানে। সে 'ফ্রি অ্যাণ্ড হানজেয়াটিক সিটি', বয়স এগারশ বছর। এবং বরাবর সে জার্মানীর অন্তর্ভুক্ত হয়েও আলাদা—'স্বাধীন শহর'। তার জন্যে আলাদা পার্লামেণ্ট। ১১৮৯ সনের ৭ই মে সম্রাট ফ্রেডারিষ বার্বারোসা নয়েনবার্গে বসে এক চার্টারে দস্তখত দেন। তাতে তিনি হুকুমনামা দিলেন: The ships and wares of Hamburg is free from toll from the sea to their town. সেই থেকে হামবুর্গ প্রতি বছর ৭ই মে তার জন্মদিন পালন করে।

আমি এলুম তার দু দিন পরে। তবে তখনও তার সারা গায়ে উৎসবের রেশ লেগে আছে। সাদা বকের মত পালতোলা নৌকায় ঠাসা আলস্টার, লম্বার্ড পুল, মার্কিন দেশের ফিফথ্ এভিনিউকে টেক্কা মারা রাস্তা য়ুংফার্ন স্টীগ, সেণ্ট মাইকেল চার্চ, রেপারবাহ্ন, ঘড়ির মুকুট পরা লাল টাউনহল, স্টেট অপেরা হাউস, পোতাশ্রয়—সব মিলিয়ে মনে হল এগারশ বছরের বুড়ো হলে কী হবে, হামবুর্গ ছাব্বিশ বছরের ডাগড়া জোয়ানের তাকত রাখে। এবং এখানে এসে টের পাওয়া যাবে না, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বোমারু বিমানগুলির প্রধান লক্ষ্যস্থল ছিল এই বন্দরী-শহর।

অদ্ভুত কর্মশক্তি নিয়ে নতুন জার্মানী গড়ে উঠেছে। লোকগুলো পুরো পাঁচ দিন গাধার মত খাটে, দু দিন চুটিয়ে ফুর্তি করে এবং দেশ গড়ার আনন্দে সারাজীবন এখানে ওখানে দাপাদাপি করে বেড়ায়। যুদ্ধে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত, পরাজিত, অপমানিত হয়েও জার্মানী তুড়ি মেড়ে তাই এগিয়ে এসেছে। ঘর ছিল না, খাবার ছিল না, টাকাও ছিল না। আর এখন? বেকার নেই, খাবার অঢেল, অন্য দেশকে অর্থ সাহায্য দেয় এবং শিল্পে বাণিজ্যে ইউরোপের সেরা সে গ্যাঁট হয়ে বসে আছে। তার কারণ? আগেই বলেছি, পরিশ্রমশক্তি। জাতির প্রতি দেশের প্রতি দরদ তো আছেই, কারিগরিজ্ঞানের চাবিকাঠিও তার হাতে।

একটি উদাহরণ হামবুর্গের হের আকজেল স্প্রিংগার। স্প্রিংগারের বিরাট প্রকাশন ব্যবসা যুদ্ধে চুরমার হয়ে যায়। যুদ্ধ শেষ হল, তিনি সর্বস্বান্ত। কিন্তু আরও দশজন জার্মান ব্যবসাদারের মতই স্প্রিংগার হতোদ্যম হলেন না। একটি পরিত্যক্ত এয়ার-রেড-শেলটার, একটি ভাঙা টাইপরাইটার এবং মাত্র চারজন সহকারী নিয়ে তিনি আবার প্রকাশন ব্যবসাতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

এখন স্প্রিংগারের বিভিন্ন কাগজে চার হাজার এবং প্রকাশন ব্যবসায়ে আট হাজার কর্মচারী খাটে। তাঁর মালিকানায় জার্মানীর বড় বড় কাগজ। ডী ভেল্ট, ভেল্ট আমজোব্‌টাগ, হামবুর্গার আবেণ্ডব্লাট, বিল্ড, বিল্ড আম জোনটাগ, হোর-ৎসু, ক্রিস্টাল এবং ডাস নয়এ ব্লাট। কোনটি দৈনিক, কোনটি সাপ্তাহিক, কোনটি পাক্ষিক এবং সব মিলিয়ে মাসিক প্রচার-সংখ্যা দশ কোটি। শহরের মাঝখানে স্প্রিংগার কোম্পানীর তেরতলা বাড়ির এদিক ওদিক ঘুরতে ঘুরতে এবং কর্মচারীদের নিরলস কাজের ধারা দেখতে দেখতে কিছুতেই আমি বিশ্বাস করতে পারিনি, মাত্র ষোল বছরে এই ভোজবাজি সম্ভব।

অনেকে বলেন, আমেরিকা পিছনে ছিল বলেই জার্মানীর এত দুঃসাহস। তা কিছুটা ঠিক, কিন্তু মার্শাল এড আরও অনেক দেশও তো পেয়েছিল, তারা তো ঠিক এমনটি হতে পারেনি।

মার্কিন প্রভাব নিয়েও নানারকম কথা শোনা যায়। গোটা জার্মানী নাকি আমেরিকার পাল্লায় পড়ে জাত খুইয়েছে। জার্মানরা কিন্তু তা মানতে রাজী নয়। জিজ্ঞেস করলে অনেকে বলেন, 'ওরা আমাদের বন্ধু বটে, তাই বলে আমরা কম কিসে? আমরা ওদের নকল করতে যাব কোন্ দুঃখে?'

হামবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের ছাত্র, কুড়িপঁচিশ বছরের ছোকরা হের হাউফমান আর এক কাঠি বাড়া। সে বলে, আরে দূর দূর, মার্কিনীরা হচ্ছে ভুঁইফোঁড়, ওরা খাসীটা দিয়েছে ঠিকই তবে এখন সেটা আমাদের। আমাদের খাসী লেজে কাটব, না গলায় কাটব ঠিক করব আমরাই।

হাউফমানের সঙ্গে নতুন আলাপ এখানে এসে। সে, আমি এবং আর একজন মাঝবয়সী জার্মান আলস্টার লেকের পারে আড্ডা মারছি। আনৃডের আলস্টার থেকে লেকের বুকে বেরিয়ে গেছে একফালি রাস্তা। তারপরেই কাঠের পাটাতন। সেখানে লঞ্চ সার্ভিসের ইস্টিশান, বিশ্রাম নেবার ঢালাও ব্যবস্থা। ইজিচেয়ার পেতে সূর্যের দিকে মুখ 'ফিট্' করে খাটাশমুখী মেমসাহেবের দল 'সান-বাথ্' নেয়, যুগল প্রেমিক নৌকো ভাড়া করে এবং আমাদের মত আড্ডাবাজের দল সময় সাবাড় করে।

মাঝবয়সী জার্মানটি—হের ফিলকি—কিন্তু মনে হল হাউফমানের কথা পুরোপুরি মানতে রাজী নন। ইজিচেয়ারের হাতলে মুখের পাইপ দুবার 'ঠকাস ঠকাস' করে বললেন, 'এতো মেজাজ দেখাচ্ছিস যে বড়, কাদের বলছিস তুই ভুঁইফোঁড়? ঐ গল্পটা জানিস—'

বলেই তিনি চুপ।

'কোন্ গল্পটা—'

পাইপের ডগায় ধুনি জ্বালিয়ে তিনি বললেন—বলছি লণ্ডনে একবার এক মজার কম্পিটিশান হয়েছিল। সবচেয়ে উদ্ভট ছোট গল্প মুখে মুখে যে বানিয়ে বলতে পারবে, সে পাবে একশ পাউণ্ডের করকরে একখানা নোট। অনেক প্রতিযোগী এসেছেন। চাকরির ইণ্টারভিউয়ের মত একজন একজন করে তিনি বিচারকের ঘরে ঢুকছেন আর মুখ আমসি করে বেরিয়ে আসছেন।

শেষমেষ ঢুকল পনের-ষোল বছরের এক ছেলে। ঢুকেই সে নামতা পড়ার মত গড়গড় বলতে শুরু করল—

Once upon a time there was a gentleman in New York—

মুখের কথা শেষ হতে না হতেই বিচারকদের চেয়ারম্যান চেঁচিয়ে বলে ওঠেন—বাস্, বাস্, 'ইউ গেট দি প্রাইজ'। ছেলেটি হতভম্ব।

বিচারক বলেন, দশটি শব্দে এমন উদ্ভট উদ্ভট কথা আর কারও মুখে শুনিনি বাপু, এ প্রাইজ তোমার না তো কার?

এদিকে আমরা দুজন হাসতে হাসতে আলস্টার লেকের জল ঘোলা করে ফেলেছি।

॥ আট ॥

ছোটবেলায় পড়া 'কোন দেশেতে তরুলতা' কবিতাটি মনের মধ্যে এমন সেঁটে গিয়েছিল, পাকাপোক্ত ধারণা করে নিয়েছিলুম, আমাদের বাংলাদেশ বুঝি সত্যি সত্যি 'সকল দেশের চাইতে শ্যামল', সবুজ মাঠ আর নীল আকাশ মিলে তার তুলনা নেই। ভুল ভাঙল ইউরোপে এসে।

এবং তখনই মনে হল আমাদের বঙ্গপ্রকৃতিপ্রেমী কবিদের দৌড় ছিল খটখটে পশ্চিম—বিহার কিংবা উত্তরপ্রদেশ। ঐ পশ্চিমের সঙ্গে তুলনা করেই বোধ হয় তাঁরা বাংলা দেশের মাথায় সবুজের মুকুট পরিয়েছেন। তা পরান, আমার আপত্তি নেই; কিন্তু স্বীকার করতেই হবে ইউরোপের এই নয়ন-ভোলানো, হৃদয়-জুড়ানো সবুজের কাছে ঢাকা-বীরভূমের সবুজ কিচ্ছু না, একেবারেই পানসে।

হামবুর্গ থেকে ট্রেনে চলেছি সেলে। হানোফারের কাছে ছোট্ট শহর—যার গায়ে গত যুদ্ধের আঁচড়টি পর্যন্ত লাগেনি, বাড়িঘর সব অক্ষত। অসংখ্য এনগেজমেণ্টে মাকু মারা দু' হপ্তার শেষে নিরিবিলি উইক-এণ্ড কাটাতে এখানে চলেছি। লাঞ্চ টেবিলে মুরগির ঠ্যাঙের জন্যে হা-পিত্যেশ বসে থেকে দেড়ঘণ্টা দু' ঘণ্টা মামুলি কথা ইনিয়েবিনিয়ে বলার ধকল এখানে থাকবে না, কিংবা দাঁতে লাগাম এঁটে ঘোড়ার মত ছুটে বেড়ানোর তাগাদাও রইবে না। স্রেফ দু'দিনের লম্বা বিশ্রাম।

ট্রেন ছুটে চলেছে সবুজ মাঠের বুক চিরে। ডাইনে বাঁয়ে যে দিকে তাকাও সবুজ আর সবুজ। পরিপাটি করে সাজানো

দূরে নীল আকাশের কোলে পাহাড়ের আবছায়া, হঠাৎ হঠাৎ লাল টালির বাড়ি, চেরী ফুলের হাতছানি। মনে হয়, গোটা এলাকাটাই যেন কেউ শো-কেসে সাজিয়ে রেখে দিয়েছে।

ট্রেনের ভেতরটাও তেমনি ঝকঝকে। সুজনি আর পাটের দড়িতে বাঁধা জাম্বুমানী বিছানার পাহাড় নেই, পানের বাটা, ডাবাহুঁকো, পেতলের ঘটিতে আর টুকিটাকি জিনিসে ঠাসা ড্রাম, ফুলকাটা টিনের সুটকেশ, গুড়ের বস্তা, কিচ্ছু নেই। হাতে ছোট্ট ব্যাগ নিয়ে একজন কি ছু'জন নেমে যাচ্ছে, উঠছে, এবং ফাঁকা ফাঁকা অসংখ্য আসনের যে কোন একটি বেছে নিয়ে বসে পড়ছে। সব কামরাই প্রায় খালি। মোটর গাড়ির যে দেশে ছয়লাপ, সেকেণ্ড হ্যাণ্ড গাড়ি যেখানে সমস্যা, সেদেশে ট্রেন কে চড়বে?

কাচে মোড়া ঢাউস জানালার কোল ঘেঁষে লম্বা করিডর,—'মর্ণিং ওয়াক' করার সখ থাকলে এসপার ওসপার করা যায়। নয়তো ডাইনিং কারে বসে কফির কাপে চুমুক দিতে দিতে সবুজের কুচকাওয়াজের 'গার্ড অব অনার' নেওয়া যায়। কিংবা যে কোন কামরায় ঢুকে কারও সঙ্গে আলাপচারী হওয়াও কঠিন ব্যাপার নয়। মোট কথা, একঘেঁয়েমির কোন চান্সই নেই।

জার্মান দেশে এসে ভয় ছিল, বুঝি সব সময়ই ইংরেজী দোভাষীর সাহায্য নিতে হবে। দেখলুম, তা নয়, এদেশের অনেকেই ইংরেজী জানে, 'এ' অক্ষর গোমাংস, থুড়ি বেগুনপোস্ত নয়, এবং এরা প্যারিসিয়ানদের মতও নয় যে ইংরেজী জানলেও ফরাসী ছাড়া 'রা' কাড়বে না।

খানিক বাদে দেখি, ছ আসনের একটি কামরার কোণেরটিতে একমেবাদ্বিতীয়ম হয়ে এক ভদ্রমহিলা আপন মনে 'বিল্‌ড্‌' নামধারী দৈনিক কাগজ পড়ে চলেছেন। বোধ হয় রগরগে কোন রহস্য কাহিনী কিংবা কোথাও কোন খুনের বিশদ বিবরণ। 'গুটেন টাগ'

আর 'ডাংকেশ্যোন' এই তুটি জার্মান শব্দ পুঁজি করে 'মা তুর্গা' বলে কামরায় ঢুকে পড়লুম। বিদেশিনী সুন্দরীর সঙ্গে খানিক আলাপচারীই হওয়া যাক। এবং এ কাজ এদেশে অতি সহজ।

জানতে চাইলুম, শ্রীমতী ইংরাজী জানেন কিনা। এবং নিজের পরিচয়টাও একফাঁকে দিয়ে দিলুম।

শ্রীমতী চোখ তুললেন, ভুরু নাচালেন, ঠোঁটের ডগার মিষ্টি হাসিটুকু সারা মুখে ছড়িয়ে দিলেন। আমি খানিক আশ্বস্ত হলুম।

পলক ফেলতে না ফেলতেই যেন জলতরঙ্গে 'সা' আর 'পা' এক সঙ্গে বেজে উঠল। শ্রীমতী মুখ খুলেছেন।—আহা কথা তো নয়, নির্জলা মধু। প্রাণ একেবারে জুড়িয়ে দিল।

বসার অনুরোধ জানিয়ে পরিষ্কার ইংরেজীতে বললেন, 'মাফ করবেন, আমি কিন্তু বৃটিশ আর আমেরিকান ছাড়া অন্য কোন বিদেশী ভাষা জানিনে।'

হাবাগঙ্গারামের মত আমি বললুম, 'এই তো আমাকে মুশকিলে ফেললেন ফ্রলাইন, আমার ইংরেজী ভাষার দৌড় কুললে তুই ফার্লং, আপনার কথার ঘোরপ্যাঁচে আমাকে প্লীজ জড়াবেন না।'

হাসির পাপড়িগুলি একসঙ্গে সব খুলে দিয়ে শ্রীমতী বললেন, 'তুটোই ইংরেজী, তবে তফাৎ অনেক, আসমান জমিন ফারাক।'

'কি রকম?'

'আমেরিকান বলতে গেলে—' শ্রীমতী গড়গড় বলে চলেন—'আপনাকে মুখের ভেতর চুইংগাম রাখতে হয়, আর বৃটিশ বলতে দরকার একখানা আস্ত গরম আলুর।'

'আলু! কেন?'—আমি আবার ক্যাবলাকান্ত বনে গেছি।

'বৃটিশরা যখন কথা বলে, আপনার কি মনে হয় না গরম আলু মুখে পুরে কথা বলছে? হুইহাই করে ওরা আদ্ধেক আদ্ধেক কি যে বলে বোঝাই দায়—'

শ্রীমতী খিলখিল করে হেসে উঠলেন যেন পুকুরঘাটে কলসীতে কেউ জল ভরছে।

আমিও হাসিতে যোগ দিই।

ততক্ষণে অনেকখানি সাহসও সঞ্চয় করে ফেলেছি। বলি, 'আর আপনারা জার্মানরা? যখন কথা বলেন, মনে হয় পেরেক ঠুকে ঠুকে জিবটাকে ইস্পাতের পাত দিয়ে মুড়ে রেখেছেন।'

'না না, মোটেই না, জার্মান ভাষা ভীষণ মিষ্টি। আমার মুখের কথা কি কাঠখোট্টা?'—শ্রীমতী কপট কোপে আমার দিকে কটমট তাকান।

একে বিদেশিনী, তায় সুন্দরী, মন জুগিয়ে কথা বলতেই হবে। বললুম, 'আপনি ব্যতিক্রম এবং ব্যতিক্রমই নিয়মের প্রমাণ।'

শ্রীমতী বিদ্যুৎলতার মত সড়াক করে উঠে দাঁড়ালেন।—কী রে বাবা, মারবে-টারবে নাকি! শুধু জিব নয়, ওদের হাতের চেটোও নির্ঘাৎ লোহার পাতে মোড়া!

শ্রীমতী 'বিল্ড্' কাগজখানাকে কোলের কাছ থেকে ছুঁড়ে ফেলে ওপরের দিকে হাত বাড়ালেন। না, মাভৈঃ, হাতখানা আমার গালের ধারে-কাছেও গেল না, বাংকে রাখা ছোট বাক্সটির ভেতর সুড়ুৎ করে গলে গেল। শ্রীমতী আমার দিকে পেছন ফিরে বাক্স হাতড়াতে হাতড়াতে বলেন, 'হাইনের নাম শুনেছেন, হাইনরিষ হাইনে? আমাদের দেশের সেরা গীতিকবি। তার কয়েকটি 'লীডার' আপনাকে পড়ে শোনাব। দেখি, আমাদের জার্মান ভাষা সম্পর্কে আপনার মতামত তারপর বদলায় কিনা।'

শ্রীমতী বইখানা বের করে পাতা উলটে হাইনের কবিতা পড়ার উদ্যোগ করছেন, সব কোলাহল থামিয়ে তাঁর কণ্ঠ থেকে উদ্‌গীত হল—Die blauen veilchen der aengelin, Die roten

Rosen wangelein ; (নীল ভায়লেট নয়ন দুটি করিতেছে ঢলঢল, রাঙা গোলাপ গাল দুখানি সুধায় মাখা সুকোমল : অনুবাদ— রবীন্দ্রনাথ।)

মোগল বাদশার মত ডানলোপিলোর সিংহাসনে হেলান দিয়ে মৌজ করব করব ভাবছি, এমন সময় বেরসিকের বেটা বেরসিক পিটার ভিলের মুখ দেখা গেল দরজার দোরগোড়ায়। এবং একটি-মাত্র কথা ছুঁড়ে দিয়ে হতভাগা সব বিস্বাদ করে দিলে। মনে হল যেন দেওয়ান-ঈ-খাসে এসে ভগ্নদূত এইমাত্র খবর দিল, শত্রুসৈন্য সীমান্তে উপস্থিত।

ভিলের বক্তব্য : 'সেলে ইষ্টিশান এসে গেছে, একখুনি নামতে হবে।'

ধুৎতেরি, আর মাইল দশ পরে সেলে স্টেশনটি থাকলে ব্রহ্মাণ্ডের কী ক্ষতিটাই বা হত !

ভিলের দিকে এমনভাবে তাকালুম সত্যযুগ হলে নির্ঘাৎ সে পুড়ে ছাই হয়ে যেত। কিন্তু কী করব যুগটা ঘোর কলি এবং যতই কেন সরকারী অতিথি হই না, সুন্দরীসঙ্গের লোভে এই বেরসিককে খুন করলে আইনের হাত থেকে কিছুতেই বাঁচতে পারব না। অগত্যা চিরতা-গেলা চেহারা করে শ্রীমতীর কাছে বিদায় চাইলুম। বললুম, 'মাফ করতে হবে, গাইডের তাড়ায় একখুনি আমাকে নামতে হবে, আপনার জলতরঙ্গী গলায় হাইনের মধুর কবিতাগুলি মধুরতর শোনার সৌভাগ্য হল না।'

শ্রীমতী হেসে বললেন, 'তাহলে যাবার আগে অন্তত স্বীকার করে যান আমাদের ভাষা খটমট নয়।'

'নিশ্চয়ই, আপনার মুখের কথা শোনার পর মত না পালটিয়ে কি পারি ? কিন্তু আপনি তো সর্বক্ষণ ইংরেজীই বলে গেলেন, জার্মান শোনার সুযোগ পেলুম কই—'

শ্রীমতী হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'হয়ত আবার কোথাও দেখা হয়ে যেতে পারে, তখন না হয় শোনাব। আউফ্ ভিডারজেহ্ন।'

'আউফ্ ভিডারজেহ্ন।'

ভদ্রমহিলার হাত ইস্পাত মোড়া নয়, মাখনে ডোবানো। পারলে ডান হাতখানা প্লাস্টার দিয়ে বাঁধিয়ে রাখতুম।

বিদায় নিয়ে চলে এলুম। ততক্ষণে ট্রেন সেলেতে এসে গেছে। ভিলের পেছন পেছন আমিও নেমে পড়লুম।

সেলে থেকে চল্লিশ কিলোমিটার দূর হানোফার। সাত লাখ লোকের বাস, ছবির মত সুন্দর শহর। হানোফারকে অক্টোপাসের মত জড়িয়ে রেখেছে অজস্র অটোবাহ্ন—ন্যাশনাল হাইওয়েজ। ছোট্ট ফোকসভাগেন গাড়িখানা নিয়ে এধার ওধার চক্কর মারছি। সঙ্গে ভিল।

তীরের মত সড়াক সড়াক ছুটে যাচ্ছে গাড়ির সারি। কোনমতে বাঁক ঘুরিয়ে সামনে এগোতেই পরিচিত একটি নাম—হামেলিন!—'ভিল, চল গাঁয়ের ভেতরে যাই।'

ঘন সবুজের বুকে ঝকঝকে বাড়ি, ফুলের বাগান, শস্যের খেত, মোটরের ভিড়; কিন্তু না, কোথাও হামেলিনের সেই বাঁশিওলা নেই।

কিন্তু দূরে এসফাল্টের রাস্তা দিয়ে ঐ যেন কে আসছে। ইঁদুরের পাল? নাকি ছোট ছেলেমেয়ের দল?

না, ওরাও কেউ নয়, গাঁয়ের রাখাল মোটর সাইকেলে চড়ে ঘরে ফিরছে। তার মুখে মাউথ অর্গান। পেছনে ধবলী, কাজলী গরুর পাল। বুঝলুম হামেলিনের বাঁশিওলা মরে গেছে, এখন সেখানে কেউ বাঁশি বাজায় না, ছেলের দল নিয়ে পথে বেরোয় না। তারা

মোটর-সাইকেল, মোটরগাড়ি চড়ে। মাউথ অর্গান, একোর্ডিয়ান বাজায়। টেলিভিশন দেখে।

হানোফারের কাছাকাছি আর একটি গ্রামে সেদিন ঢুকেছিলুম। তার নাম বিসেন-ডর্ফ। গ্রাম বলা ভুল, আমাদের যে কোন শহরের চেয়ে বাড়া। যেন ছিল স্টেশন। ঝকঝকে পাকা রাস্তা, বাড়িতে বাড়িতে মোটর গ্যারেজ, সাজানো-গোছানো আধুনিক কায়দার বাড়ি, ঘরে ঘরে বিজলী আলো, রেফ্রিজারেটার, টেপ-রেকর্ডার, টেলিভিশন সেট। পার্ক, রেস্তোরাঁ, হোটেল, খেলার মাঠ সবকিছু। কোন্ দুঃখে যে এইগুলিকে গ্রাম বলা হয় জানিনে।

বাহ্যিক চেহারায় দীনতম একটি বাড়িতে ঢুকে পড়লুম। বাড়ির মালিকের নাম এরিখ। হলদে দাঁতের পাটি এপাশ-ওপাশ খুলে দিয়ে এগিয়ে এল। 'ইণ্ডার! নেহরু?'

হ্যাঁ তাই। নেহরুর দেশেরই লোক।

সে বলল তার কাজ ক্ষেতমজুরী। আর দুধ দোয়। মাসের আয় কমসে কম চারশ মার্ক অর্থাৎ প্রায় পাঁচশ টাকা। সংসারে দুজন। নিজে আর বুড়ো বাপ। এখনও বিয়ে করেনি।

আমি এদিক-ওদিক তাকাই এবং কোথাও টেলিভিশন সেট না দেখে নিশ্চিন্ত হই। যাক বাবা, একটা বাড়ি অন্তত পেলুম যেখানে এই জিনিসটি নেই।

কোণের ঘরটায় শুধু রেডিও বাজছে। বার্লিনের অলিম্পিক স্টেডিয়ামে জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইন্যালে কলোন-নুরেমবার্গে লড়াইয়ের ধারাবিবরণী। তারই দাপটে গোটা ঘর গমগম।

ভিলের মারফৎ এরিখকে জিজ্ঞেস করি, সে টেলিভিশন কিনছে কবে?

'শীগগীরই কিনব'—এরিখ চটপট জবাব দেয়—'এখনকার সেটটা বড় জ্বালাতন করছে।'

'সেট আছে নাকি তোমার?'—আমার বিস্মিত জিজ্ঞাসা।

'বাঃ রে, থাকবে না কেন, ঐ তো ড্রয়িংরুমে আধশোয়া পড়ে আছে। টেলিভিশন ছাড়া কি কেউ বাঁচতে পারে? তোমার বাড়িতে নেই?'

এরিখের উত্তর কী দেব? যে দেশের গ্রামে এখনও মোটরগাড়ি ঢুকলে অর্ধ-উলঙ্গ ছেলের দল ভিড় করে দাঁড়ায়, টেলিভিশন সেটের চেহারা কি রকম প্রায় কেউ জানে না, ঘড়ি-রেডিও-সাইকেল বিলাসিতার জিনিস, কেউ কেউ আধপেটা খায়—আমি যে সেই দেশ থেকে এসেছি।

এরিখের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আবার গাড়িতে উঠি। ভিলকে জিজ্ঞেস করি সব গ্রামে একই অবস্থা কিনা। ভিল বলে, 'হ্যাঁ, সব জায়গাতেই মোটামুটি এক চেহারা।'

'রুশ-অধিকৃত পূর্ব জার্মানীতেও?'

'তা কেন হবে, কম্যুনিস্ট শাসনে কেউ সমৃদ্ধ হতে পারে না।'

জানতুম ভিল ঘোর কম্যুনিস্ট-বিরোধী। তবু বললুম, 'কী করে জানলে ভায়া? আমি যতদূর জানি সেখানেও তো দারিদ্র্য নেই, বেশ সচ্ছল অবস্থাই।'

ভিল এই প্রশ্নে কোন যুক্তি মানতে নারাজ। চটেমটে বলে—'নট বাই ব্রেড এলোন স্যার। সেখানে ফ্রিডম কোথায়? চলার, বলার, কাজ করার?'

আমি তার এই কথায় কোন সাড়া দিই না। কারণ কম্যুনিস্ট-শাসিত দেশ সম্পর্কে আমার কোন অভিজ্ঞতা নেই, পূর্ব বার্লিনে

কয়েক ঘণ্টা থাকা ছাড়া। এবং তাই দিয়ে কোন মতামত তৈরী করা যায় না।

ভিল আমাকে দলে না পেয়ে তখন বলে, 'দাঁড়াও, তোমাকে এক গল্প শোনাই। তিন দেশের তিন সার্জন এক জায়গায় মিলেছেন। একজন জার্মান, একজন ফরাসী এবং একজন রুশী। কোন্ অপারেশন সবচেয়ে কঠিন তাই নিয়ে তিনজনে আলাপ চলছে। জার্মান সার্জন বললেন, ব্রেন অপারেশনই সবচেয়ে কঠিন। ফরাসীটি বললেন, হার্ট।

রুশী সার্জনের মুখে কোন কথা নেই। তাঁকে পীড়াপীড়ি করতেই বললেন, 'আমার মতে টনসিল অপারেশনই কঠিন।'

জার্মান ও ফরাসী সার্জন দু'জনেই বিস্ময়ে হতবাক। ভদ্রলোক বলে কী! টনসিল কাটা তো সবচেয়ে সোজা।

নিরুপায় রুশী তখন বললেন, 'না, রসিকতা নয়, সত্যিই তাই। মুখ তো বন্ধ, আমাদের দেশে কানের ভেতর দিয়ে টনসিল কাটতে হয়।'

ভিল গল্পটা বলে নিজেই হো হো করে হেসে ওঠে। আমি বললুম, 'গল্প হিসেবে ভাল মানছি, কিন্তু সে গল্পই—তার বেশী নয়।'

আমাদের গাড়ি ততক্ষণে সেলে এসে পৌঁছেছে।

॥ নয় ॥

রাইন নদীর দুপারে সারবাঁধা শিল্প শহর। ডর্টমুণ্ড, বোকুম, এসেন, ডুইসবুর্গ, ডুসেলডর্ফ, কলোন। এখনকার আকাশ ধোঁয়ায় তামাটে, ক্রেন আর চিমনির কাটাকুটিতে ফালিফালি। মাঝখানে অলস ঔদাস্যে তরতর ছুটে চলেছে জার্মানীর প্রাণগঙ্গা রাইন।

এসেনে আলফ্রিড ক্রুপের অতিথি ছিলুম। তাঁদের পেল্লায় প্রাসাদ ভিলা হুগেলে লাঞ্চটি সেরে ডুসেলডর্ফ এসে পৌঁছেছি। হাইনরিষ হাইনের বাড়ি আর ড্রুপার প্রিন্টিং মেশিনারি একজিবিশন দেখে ঢুকেছি মোৎসার্ট স্ট্রাসের এক রেস্তোরাঁয়। চেয়ারে বসতে না বসতেই নারীকণ্ঠের কলকাকলি—বিটে। বক্তব্য: কি চাই?

অষ্টপ্রহর এই 'বিটে' শুনে শুনে হয়রান। আক্ষরিক অর্থে প্লীজ, কিন্তু জার্মান ভাষার সর্বঘটে কাঁঠালী কলা এই বিটে। উঠতে বসতে চলতে ফিরতে বিটে আর বিটে। টিকিট চাই—বিটে। কেমন আছেন—বিটে। কি বলছেন—বিটে। বইটা কোথায়—বিটে।

বীয়ারের ঢ্যাঙা গেলাস দেড় চুমুকে সাবাড় করে ভিল বললে, আর ডাংকেশ্যোন—বিটেশ্যোন?

'হ্যাঁ, তাও বটে'—আমি বলি, 'তবে সেতো ভায়া তোমাদের শ্বাস-প্রশ্বাসের মত স্বাভাবিক হয়ে গেছে। কিউর পেছনে যেমন 'ইউ', মন্ত্রীর পেছনে যেমন ডেপুটি মন্ত্রীর লেজুড়, ঠিক তেমনি তোমাদের ডাংকেশ্যোন আর বিটেশ্যোন। একেবারে অটোমেটিক মেসিনের মত। একজন ডাংকেশ্যোন (থ্যাঙ্ক ইউ) বলতে না বলতেই অন্যজনের মুখে তৎক্ষণাৎ বিটেশ্যোন (নো-মেনশন)। যেন টেপ রেকর্ড করা, শুধু চাবিটা টিপলেই হল।'

'দাঁড়াও তোমাকে একটা গল্প বলি'—পকেট-চিরুণীতে চুল সামলে নিয়ে ভিল শুরু করে।

এক জাপানী ভদ্রলোক এসেছেন এই ডুসেলডর্ফে বেড়াতে। বুড়ো মানুষ, তদুপরি হার্টের রোগী। নিরিবিলি কোন হোটেলে থাকতে চান। ভদ্রলোকের জার্মান হোস্ট ফাঁকা মাঠের মাঝখানে শহরতলীতে এক হোটেল ঠিক করে দিলেন। পরদিন ভোরবেলা অবাক কাণ্ড, মালপত্তর বগলদাবা করে ভদ্রলোক সেই জার্মান হোস্টের বাড়ি হাজির।—না, থাকতে পারলাম না। উঃ বাপরে, কোথায় নিয়ে তুলেছেন আমাকে? পাশে রেল স্টেশন, সারারাত ইঞ্জিন শান্টিংয়ের ঘড়র ঘড়র। এক ফোঁটা ঘুম হয়নি।

'জার্মান হোস্ট আকাশ থেকে পড়েন। কাছাকাছি কোথাও তো বাহ্‌নহোফ অর্থাৎ রেল স্টেশন নেই। সরেজমিন তদন্ত করতে তিনি ছুটলেন ঐ হোটেলে। গিয়ে দেখেন কাছেই এক নতুন চারতলা বাড়ি উঠছে। প্রায় তিনশ মজুর সেই বাড়ির কাজে হাত লাগিয়েছে। চার ধারে ইটের স্তূপ। নীচ থেকে ওপরে উঠছে। একটি মজুর আর একটির হাতে ইটের ঝুড়ি পাচার করতেই একজন বলছে ডাংকেশ্যোন এবং অন্যজন তৎক্ষণাৎ বলছে বিটেশ্যোন। এইভাবে একসঙ্গে দেড়শ'র মুখে ডাংকেশ্যোন এবং বাকি দেড়শ'র মুখে বিটেশ্যোন। তাই মিলে তিনশ কণ্ঠের অতিক্রেত অভূতপূর্ব কোরাস—ডাংকেশ্যোন-বিটেশ্যোন, ডাংকশ্যোন-বিটেশ্যোন, ডাংকে-শ্যোন-বিটেশ্যোন। এবং ঐ বিচিত্র শব্দে ওদের দুজনের মনে হল সত্যিই যেন রেল ইঞ্জিনের শান্টিং চলছে এ লাইন থেকে ও লাইন।

জাপানী ভদ্রলোক তখন হেসে কুটিকুটি। হাসির চোটে খুদে খুদে চোখ দুটো মুখ থেকে বেমালুম বেপাত্তা।

ভিল থামতেই আমি বলি, 'পুরোনো গল্প, দেশে থাকতেই অনেকের কাছে শুনেছি।'

ভিল—'তাহলে আমাকে মাঝপথে থামিয়ে দিলে না কেন?'

আমি—'সে কি হয়, এত পাঁয়তারা কষে গল্প ফেঁদেছ, তোমাকে নিরাশ করে লাভটা কী? আমার কি তাতে বাড়তি দুটো হাত গজাবে?'

রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে কলোনের পথ ধরেছি। 'কলোনের জলের' (অ-ডি-কলোন) ছিটেফোঁটা শুঁকেছি এবং ছোটবেলা থেকেই নামটা জানা, এতদিন পরে শহরটির সঙ্গে মোকাবিলা হবে ভাবতেই মজা লাগছে।

মাকড়সার জালের মত গোটা জার্মানী জুড়ে অজস্র অটোবাহ্ন-ন্যাশনেল হাইওয়েজ। তারই একটা ধরে মোটর একশ কিলোমিটার বেগে ছুটে চলেছে। পুব থেকে পশ্চিম, উত্তর থেকে দক্ষিণ—এই রকম শত শত চওড়া রাস্তা দৌড় দিয়েছে। কোনটি মিউনিক, কোনটি হামবুর্গ, কোনটি বার্লিন। এই রাস্তাগুলি প্রধানত তৈরী করিয়েছিলেন হিটলার। জার্মানীর অনেকে এই একটি কাজের জন্যে অন্তত হিটলারের জয়ধ্বনি দেয়।

১৯৩৩ সনে হিটলার যখন সর্বময় কর্তা, দেশে চূড়ান্ত বেকারী। লাখ লাখ লোককে তিনি লাগিয়ে দিলেন রাস্তা তৈরীর কাজে। বেকার সমস্যার সমাধান হয়ে গেল এবং কয়েক বছরের মধ্যেই গোটা জার্মানী শত শত চওড়া রাস্তার যোগসূত্রে চলে এলো হাতের মুঠোয়। কিন্তু তখন কে জানতো, আসন্ন যুদ্ধের কথা স্মরণে রেখে রসদ আর অস্ত্রশস্ত্র চলাচলের প্রয়োজনেই হিটলারের মাথায় খেলছে অটোবাহ্ন তৈরীর পরিকল্পনা!

তবু অস্বীকার করে লাভ নেই, এই রাস্তাগুলো দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত জার্মানীকে নতুন করে গড়ে তুলতে অনেক সাহায্য

করেছে। তাছাড়া সমস্ত ক্ষয়ক্ষতি সারিয়ে আজ যে-জার্মানী কলোনের ঐ উঁচু গির্জের মত মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে, তার পেছনে জার্মান জাতির অদ্ভুত মনোবল ও পরিশ্রম-শক্তি যথেষ্ট পরিমাণে কাজ করেছে। সঙ্গে সহযোগিতা করেছে আরও অনেক সদ্‌গুণ। বিশেষ করে ঐতিহ্যের প্রতি প্রত্যেক জার্মানের অপরিসীম শ্রদ্ধা। এই শ্রদ্ধার পরিণামই বোধ হয় তীব্র জাতীয়তা।

গত যুদ্ধে টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছিল এই রূঢ় এলাকার সব কারখানা। উৎপাদন ছিল না, রপ্তানী ছিল না, সমৃদ্ধি ছিল না। আর এখন? ভাঙা টুকরো জোড়া লাগিয়ে রূঢ় এলাকা আবার যে-কে-সেই। তীব্র জাতীয়তা না থাকলে কি এত সব ভোজবাজি সম্ভব?

এই এলাকার আর একটি দ্রষ্টব্য পরিচ্ছন্নতা। ইউরোপের সব শহর গ্রামই ছবির মতন। কিন্তু ভেবেছিলুম কলকারখানার খেসারৎ দিতে গিয়ে এখানে কিছুটা অপরিচ্ছন্নতা হয়ত দেখতে পাব। মোটর গাড়ির জানালা দিয়ে দুপাশ দেখতে দেখতে আমার সে ভুল ভাঙল। প্রত্যেকটি জায়গা, প্রত্যেকটি কারখানা আমাদের পুজোর ঘরের মত পবিত্র।

কলোনে এসে মনে পড়ল চ্যান্সেলার আডেনাওআরের কথা। তিনি এই শহরেরই লোক। নতুন জার্মানী গড়ার কাজে সবাই স্বীকার করে দু'টি ব্যক্তির অপরিশোধ্য ঋণ। একজন অর্থমন্ত্রী লুডভিগ এরহার্ড, অন্যজন চ্যান্সেলার কনরাড আডেনাওআর। জার্মানরা বলে, এই দুজন না থাকলে আমরা এত তাড়াতাড়ি উঠতে পারতুম না, হয়ত সেই কোমরভাঙা অবস্থায় আরও অনেক দিন পড়ে থাকতে হত।

চ্যান্সেলার আডেনাওয়ার অতি বৃদ্ধ, বয়স নব্ব্ইয়ের কাছাকাছি। কিন্তু কর্মশক্তিতে এখনও তাজী ঘোড়া। নেহরুর সাম্প্রতিক অসুখের কথা শুনে সাতাশী বছরের এই জোয়ান নাকি বলেছেন—'নেহরু এবারে বুড়ো হয়ে গেছেন।'

আডেনাওয়ার সম্পর্কে আর একটি গল্প বলল আমাদের গাড়ির ড্রাইভার। চ্যান্সেলারের এক নাতি আছে ছ' বছরের। চ্যান্সেলার একদিন তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'বড় হয়ে তুই কী হতে চাস্?'

'ফেডারেল রিপাবলিক অব জার্মানীর চ্যান্সেলার'—গম্ভীর গলায় ছেলেটি জবাব দেয়।

'তা কী করে হয়?' আডেনাওয়ার নাতিকে বলেন, 'তুই চ্যান্সেলার একসঙ্গে থাকার বিধান তো আমাদের কনস্টিট্যুশনে নেই।'

রেল স্টেশনের গায়ে লাগা ১৬০ মিটার উঁচু, কলোনের প্রধান দ্রষ্টব্য ঐ গির্জের পথে স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে গাড়ির ড্রাইভার বললে, 'এই হচ্ছেন আডেনাওয়ার, এই বয়সেও এক নাগাড়ে আরও অনেকগুলো টার্ম কাজ করে যাওয়ার মত মনের জোর রাখেন।'

॥ দশ ॥

জাঁকজমকের কথা যদি ধরেন, আমাদের কলকাতার সঙ্গে বনগাঁর যা তফাৎ, বার্লিন-হামবুর্গের সঙ্গে বনেরও তাই। বন ইদানিং পশ্চিম জার্মানীর সদরদপ্তর; কিন্তু জার্মানরা মনে করে বার্লিনই তাদের আসল রাজধানী, এবং সেই কারণেই তাকে আদুরে মেয়ের মত এত সাজিয়ে গুছিয়ে রেখেছে। বন শহরের নামডাক তার বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্যে, বীটোফেনের জন্যে। শহরটা এতদিন ছিল শিক্ষার্থীর আর সংগীত বিলাসীর, এখন তার সঙ্গে জুটেছেন দেশ-বিদেশের ডিপ্লোমেটের দল।

আয়তনে বড়, তবু ঘরোয়া। গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে ছোট ছোট বাড়ি, ছোট ছোট রাস্তা, সবেধন নীলমণি ডাঙর রাস্তা কোব্‌লেনৎসার স্ট্রাসে। দু' পা পেরোলেই ঘন বন, পাহাড়। আবাদ করে নতুন নতুন বাড়ি উঠছে—সরকারী বেসরকারী।

পশ্চিম জার্মানী সফরের শেষ ধাপে এসেছি রাইন নদীর কূলে—এই বনে। এসে ব্যস্ততার সীমা নেই। প্রতিদিনই পার্টি—লাঞ্চে, ডিনারে। পররাষ্ট্র দপ্তরের ভারতীয় শাখার প্রধান, অর্থনৈতিক সহযোগিতা বিভাগের অধ্যক্ষ, গৃহনির্মাণ ও উদ্বাস্তু পুনর্বাসন দপ্তরের সচিব—একের পর এক এঁদের সঙ্গে বৈঠক, খানাপিনা। দম ফেলার ফুরসৎ নেই।

হিসেব মেলাতে গিয়ে দেখি, আমাদের আলোচনার প্রধান বিষয় দাঁড়িয়েছে তিনটি। তার মধ্যে একটি হচ্ছে জার্মানী প্রবাসী বাঙালী কারিগরের দল।

পশ্চিম বাংলা থেকে পশ্চিম জার্মানী—ষোল হাজার কিলোমিটার দূর ; কিন্তু সেই দূরকে নিকট করে কী পরিমাণ গৌড়তনয় এদেশে ছুটে এসেছেন, গত ক'বছরের "উচ্চশিক্ষার্থে বিদেশ যাত্রার" বিজ্ঞপ্তি দেখলেই টের পাওয়া যায়। রাইটার্স বিল্ডিং-এর লোয়ার ডিভিশন কেরানী, পাড়ার বেকার ছেলে, তিন ধাক্কায় আই-এস-সি বা আই-এ পাশ ছাত্র, অনেকেই এই দলে আছেন। কেউ বাপের ব্যাঙ্কে জমানো টাকা বগলদাবা করে, কেউ ঘটিবাটি বিক্রি করে এবং সবাই আত্মীয়-স্বজনের সামনে অসীম সম্ভাবনার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ 'সেফ ডিপোজিট ভোল্টে' রেখে এই দূর দেশে পাড়ি দিয়েছেন।

কিন্তু এঁদের অধিকাংশের দুর্গতি স্বচক্ষে দেখে আমার বারবার মনে হয়েছে, তার চেয়ে কালকাতায় বসে ভেরেণ্ডা ভাজাও বোধ হয় ভাল ছিল। দুই সরকারের যোগসাজসে যাঁরা এসেছেন তাঁদের কথা আলাদা, তাঁরা সতি সত্যি কাজ শিখছেন, ফিরে গিয়ে দেশের কাজেও লাগতে পারবেন। সমস্যা হুজুগে বিদেশযাত্রীদের নিয়ে, এবং এঁদের সংখ্যাই বেশী।

এখানেই আলাপ হল কয়েকটি বাঙালী কর্মীর সঙ্গে। ওঁরা কাজ করেন কলোন, ডুসেলডর্ফ, আখেন, স্টুটগার্টে। প্রবাসে দুই বাঙালীতে দেখা হলে যা' হয়, অনর্গল বাক্যস্রোত, উচ্ছ্বাস, কলকাতার খবর এবং দেশের জন্যে হা-হুতাশ।

খানিক আলাপের পর টের পেলুম, এঁরা কেউই তেমন সুখী নন এখানে, দেশে ফেরার জন্যে ব্যাকুল, পা বাড়িয়ে বসে আছেন। অধিকাংশই মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে, বিলেত ফেরত হবার হুজুগে বিদেশে পাড়ি দিয়েছেন।—'ইচ্ছে ছিল কাজ শেখার, কিন্তু নো চান্স। এখন কাজ করতে হচ্ছে সাধারণ শ্রমিকের, হাড়ভাঙা খাটুনি, কারিগরি বিদ্যে কেউ শেখায় না। দেশে তাহলে ফিরবো কী নিয়ে?

চাকরি পাবই বা কী করে? রোজগার? তা ভালই হচ্ছে, মাসে প্রায় পাঁচশ টাকা। খরচও তেমনি, হাতে কিচ্ছু থাকে না। মেয়ে-বন্ধু জুটলে তো কথাই নেই, ছেলেবন্ধুর কাছে হাত পাততে হয়। এত খাটুনিও সহ্য হয় না। তা হোক, দেশে ফিরে ভাল চাকরি যদি জুটত, কেয়ার করতুম না। তারও যে উপায় নেই, এ ক'মাসে জেনে গেছি। আর তাই যদি না পেলুম তাহলে এলুম কেন এত টাকা খরচ করে? না না, মা-বাবাকে এ-সব জানাই নি, অনর্থক তাঁরা কষ্ট পাবেন, চিন্তা করবেন।'

সকলের মুখে ঐ একই কথা। অনেকে আবার অভিযোগ করেছেন, কোন কোন ফার্ম শিক্ষানবীশ হিসেবে চাকরি দিয়েছিল, কিন্তু এখানে আনিয়ে কাজ করাচ্ছে মজুরের। এদেশে মজুরের অভাব, ইতালী স্পেন থেকে যেমন হাজার হাজার আসে, ভারত থেকেও এইভাবে আসছে। গাঁটের পয়সা গচ্চা দিয়ে।

কথাটা তুলেছিলুম জার্মান সরকারের বড়কর্তাদের কানে। তাঁরা তো শুনে আকাশ থেকে পড়লেন। বললেন, তাই নাকি? জানি না তো? আর দেখুন, এগুলো কোন সরকারী ব্যাপার নয় নইলে এক্ষুনি ফয়সালা করা যেত। তা হোক, আমরা খোঁজ নেব এবং আপনারা কলকাতায় আমাদের কনসাল জেনারেলের কাছে কথাটা তুলবেন। আমরা চাই না এইভাবে আমাদের দেশের বদনাম হোক।

এই প্রবাসী বাঙালী ছাত্রদের সমস্যা ছাড়া আর দুটি বিষয় নিয়ে আমাকে মোকাবিলা করতে হয়েছে। এবং এই রূঢ় এলাকাতেই বেশী। একটি হচ্ছে গোয়া। বাঙালী কর্মীদের অনেকে বললেন, 'গোয়ার ঘটনার আগ পর্যন্ত আমাদের দারুণ খাতির ছিল নেহরুর

দেশের লোক বলে। এখন ওঁরা আমাদের যা তা গালমন্দ দেয়। তাদের ধারণা, আমরা গোয়া দখল করে দারুণ অন্যায় কাজ করেছি।'

আমাকেও অনেক জার্মান বন্ধু এ-বিষয়ে প্রশ্ন করেন। জানতে চান, শান্তির বুলি কপচে নেহরু নিজে কেন যুদ্ধে নামলেন ?

তাঁদের বুঝিয়ে বলি, গত পনের বছর ধরে ভারতের ধৈর্যশক্তি এবং পর্তুগালের ঔদ্ধত্যের কথা, স্বাধীন ভারতে ঔপনিবেশিক দুষ্টক্ষত পুষে রাখার বিরুদ্ধে ভারতবাসীর মনোভাবের কথা। শুনে তাঁরা বিস্মিত হলেন, বললেন, তাই নাকি, এ-সব তো আমরা জানতুম না ! হঠাৎ কাগজ খুলে দেখি মার মার কাট কাট ব্যাপার, ভারতের সৈন্য গোয়া দখল করে ফেলেছে।

আমার ধারণা গোয়ার ব্যাপারে পশ্চিম জার্মানীতে বিরূপ মনোভাবের কারণ দুটি। প্রথমত এদেশী সংবাদপত্রের একপেশে সংবাদ পরিবেষণ, দ্বিতীয়ত গোয়া দখলের পটভূমিকা বিশদভাবে বুঝিয়ে বলার ব্যাপারে ভারতীয় দূতাবাসগুলির ব্যর্থতা। সাধারণ লোকের বিশেষ দোষ নেই, তারা ভারতের রাজনীতি, ভারতের ইতিহাস কিছুই জানে না। হঠাৎ একদিন কাগজ খুলে, টেলিভিশন চালিয়ে জানল, গোয়ার ভেতরে ভারতীয় সৈন্য—নেহরু আক্রমণ করেছেন।

বনে ভারতীয় দূতাবাসে প্রশ্নটি তুলেছিলুম, তাঁরা অন্য কথা পাড়লেন।

গোয়ার পরেই রাউরকেলা ইস্পাত কারখানা। আমাদের দেশে এই নিয়ে হৈ-চৈ হয়েছে, এখনও হচ্ছে। তবে এখানকার অনেকেই দোষ দিতে চান হিন্দুস্তান স্টিল কর্তৃপক্ষকে। এসেনে

বিখ্যাত ক্রুক কোম্পানীর একদা-নিবাস ভিলা হুগেলের লাঞ্চ টেবিলে বসে একজন বলে বসলেন, 'আমরা কী করব, দোষ আপনাদের হিন্দুস্তান স্টিলের জেনারেল ম্যানেজারের। তড়িঘড়ি তিনি পয়লা ব্লাস্ট ফার্নেস তৈরী করিয়েছেন। তেসরা ব্লাস্ট ফার্নেস ঢাকা দিয়ে বৃষ্টির জল আটকাননি, ভারতীয় কারিগররা ঠিক মত কাজ করছেন না।' তিনি তাদেরই জোগাড় করা এক গোপন রিপোর্টের কয়েকটি অংশ পড়ে শোনালেন।

আর একজন বললেন, রাউরকেলায় আমরা যা বানিয়ে দিয়েছি তেমন আধুনিক কারখানা আমাদের দেশেও নেই, গোটা পৃথিবীতে আর আছে দুটি কি তিনটি।

আমি বললুম, ভারতীয় কারিগরদের দোষ দিয়ে লাভ নেই। আপনাদের অভিযোগ সত্যি হলে ভিলাই ও দুর্গাপুর এত ভাল কাজ করত না। তাছাড়া কারখানা তৈরী করার পর আপনাদের দায়িত্ব ফুরিয়েছে, একথা বলাও ঠিক নয়। এই কারখানার সাফল্যের ওপর ভারতে জার্মানদের সুনাম অনেকখানি নির্ভর করছে।

অনেক কথা বলাবলির পর একজন বললেন, ভিলাইয়ে সুবিধে অনেক, রুশ সরকার একাই কাজ করেছেন, আমাদের করতে হয়েছে ৩০।৪০টি কোম্পানী একসঙ্গে মিলে, তাতে বাধা বিস্তর। যাই হোক আমরা আবার আমাদের লুপ্ত সুনাম উদ্ধারের চেষ্টা করব এবং দেখবেন রাউরকেলা শীগগিরই ভারতের সেরা ইস্পাত কারখানা হয়ে উঠবে।

আমি বললুম, আমরাও তাই চাই।

পশ্চিম জার্মানীর সোস্যাল ডেমোক্রেট দলের একজন হোমরা-চোমরা পরদিন বুণ্ডেস্টাগের (সেক্রেটারিয়েট) ক্যান্টিনে বসে নতুন কথা বললেন। তাঁর মতে রাউরকেলায় ভাল কারিগর পাঠানো

হয়নি। এমনিতেই শ্রমিকের ঘাটতি জার্মানীতে, তার ওপর কারিগরদের মাইনেপত্তর এখানে খুব ভাল। নিজের দেশ ছেড়ে গরম দেশ ভারতে গিয়ে কাজ করতে কোন ভাল কারিগরই রাজী হয়নি। যারা গিয়েছে, তাদের অনেকেই অতি সাধারণ, তাদের দিয়ে ভাল কাজ আশা করা যায় না।

পশ্চিম জার্মানী সফর শেষ করে কলোন এয়ারপোর্টে লণ্ডনের প্লেন ধরার পথে বারবার ভেবেছি, ঐ অভিযোগটি কি সত্যি ?

॥ এগারো ॥

বন-কলোন এয়ারপোর্ট থেকে শূন্যে দিলুম লাফ। ইংলিশ চ্যানেল পেরিয়ে এক লাফে হাজির লণ্ডন। এবং এখানে এসে এতদিন পর 'হাজি' হলুম। দু'শ বছর যাদের কাছে তরিবৎ-এর তালিম নিয়েছি, সেই ইংরেজদের খাস তালুকে না এলে বিদেশ-ভ্রমণই যে বরবাদ।

কিন্তু এখানে এসে কী আর দেখব, সবই তো চেনা। বাকি শুধু দু' চোখ দিয়ে মিলিয়ে নেওয়া। ট্রাফালগার স্কোয়ারে নেলসন কলামের তলায় পাখা ঝটপট করা প্রত্যেকটি পায়রা, বিগবেন ঘড়ির এ-পাশের সেই কালো দাগ, পিকাডিলির আলোর বিজ্ঞাপন, হাইড পার্কের সেই নিগ্রো 'বক্‌বক্তা', সোহো পাড়ার ইতালিয়ান রেস্তোরাঁ, টাওয়ার অব লণ্ডনে ঝিকমিক করা কোহ্-ই-নুর, ন্যাশনাল আর্ট গ্যালারির বারান্দায় বসে সিটি মারনেওলা টেডি বয়—সব সব। পার্ক স্ট্রীট আর ডালহৌসি পাড়ার বাড়িগুলোর গায়ে এক পোচ কালো পলেস্তারা মেরে গোটা কলকাতাকে যদি তাই দিয়ে মুড়ে দেওয়া হয়, তা হলেই মোটামুটি লণ্ডন হয়ে গেল। এখানকার দোতলা বাস, লেটার বক্স, পাবলিক টেলিফোন বুথও কলকাতার প্রোটোটাইপ। তফাৎ শুধু আবহাওয়ায়। কলকাতা রোদের ঝিলিকে যখন-তখন হাসে, লণ্ডন ছিচকাঁদুনে, অষ্টপ্রহর মুখ গোমড়া করে বসে আছে।

হাউস অব পার্লামেণ্টে গণ্যমান্য কয়েকজন এম-পি'র সঙ্গে লাঞ্চ খেতে বসে ঐ সব কথাই বলছিলুম। লেবার পার্টির ডগলাস

হাউটন সুপের বাটি সুরুৎ সুরুৎ সাবাড় করে জিজ্ঞেস করেছিলেন, কেমন লাগল লণ্ডন? কনজারভেটিভ দলের উইং কমাণ্ডার বুলুসও তাকিয়ে রইলেন আমার মুখের দিকে।

হাউটন আমার কথায় সায় দেন। কলকাতায় গিয়েছেন অনেকবার, নেহরুর সঙ্গে দোস্তী আছে, কেন্দ্রীয় বেতন কমিশনের কাজে সাহায্য করেছেন ভারত সরকারকে। স্পষ্ট বক্তা এবং ইনিই একমাত্র বিদেশী যাঁকে বলতে শুনলুম—'গোয়া দখল করে ভারত ঠিকই করেছে। কালো চামড়ার হাতে সাদা চামড়া মার খেয়েছে কিনা, তাই আমাদের এত রাগ।'

'একটা জিনিস আমার ভাল লাগেনি'—আমি নতুন কথা পাড়ি।

'কী জিনিস?'—উপস্থিত সকলের কোরাস জিজ্ঞাসা।

'মার্কিনী কায়দায় এত স্কাইক্র্যাপার লণ্ডনের আকাশে বড় বেমানান, টেমস নদীর দু'পারে, হাইড পার্কের কিনারে গাদা গাদা ঢ্যাঙা বাড়ি আকাশে খোঁচা মারছে। না উঠলেই বুঝি ভাল ছিল—'

সেণ্ট্রাল অফিস অব ইনফরমেশনের মিস্টার হলরয়েড আমায় থামিয়ে দিলেন, বললেন, 'স্থানাভাবের একটা ফয়সালা করতে হবে তো, আকাশে না উঠে উপায় কী?'

হাউটন মুখ খোলেন, বলেন, 'মানলুম, তবু লণ্ডনের একটা ট্র্যাডিশান আছে, ঐ বেঢপ বাড়িগুলো দেখলে রাগে আমার সারা শরীর রী রী করে—'

কমনওয়েলথ রিলেশনস্ বিভাগের মিস্টার ম্যাকবাইন জানান ঐ সব বাড়ি তাঁরও অপছন্দ।

হলরয়েড পাল্টা জবাব দেন, 'পছন্দ অপছন্দের প্রশ্ন নয়, প্রশ্ন প্রয়োজনের। আপনারা বোধ হয় চান শহরটাকে আস্ত একখানা

মিউজিয়াম বানিয়ে রাখা হোক, ট্যুরিস্টরা এসে চেখে চেখে দেখুক, আর আমরা শহরছাড়া হয়ে আইল অব ম্যান-এ গিয়ে ঘর বাঁধি।'

'কিন্তু ট্র্যাডিশান?'—আমার পুনরুক্তি—'ঐ ট্র্যাডিশানের জন্যেই তো আপনাদের এই হাউস অব কমন্সে ছ'শ তিরিশ জন এম-পির জন্যে কুললে সাড়ে তিনশ আসন। বার বছর আগে নতুন ঘর বানিয়েও তাই। ট্র্যাডিশানের ঠেলা সামলাতে গিয়ে অনেক এম-পিকে তালগাছের মত ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকতে হয়'—

কথায় কথা বাড়ে। কী কুক্ষণে স্কাইক্র্যাপার প্রসঙ্গ তুলতে গিয়েছিলুম। এবারে দোসরা বাত। না, তারও উপায় নেই। ছুটো কুড়ি, অধিবেশনের সময় হয়ে গেছে। আমাদের এক্ষুনি উঠতে হবে।

প্রেস গ্যালারিতে বসে হাউস অব কমন্সের ফরেন এফেয়ার্স ডিবেট শুনছি। ইতিমধ্যে দেখে এসেছি, হাউস অব লর্ডস, ওয়ারেন হেস্টিংসের বিচার প্রাঙ্গণ, শত শত চিত্রাঙ্কন, আশ্চর্য আশ্চর্য ভাস্কর্যকলা।

ডিবেটের শুরুতেই জোর প্রতিবাদ, লাওসে বৃটিশ জঙ্গী বিমান পাঠানোর বিরুদ্ধে। লেবার পার্টির তিন বিদ্রোহী এই আপত্তি তুলেছেন এবং তাঁদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন লিবারেল দল। তাঁদের বক্তব্য: সিদ্ধান্ত নেবার আগে হাউসের মতামত নেওয়া উচিত ছিল। হাউস কি বসে বসে ঘোড়ার ঘাস কাটবে?

বিরোধী দলনেতা গেইটস্কেল উপস্থিত নেই। তাঁর ডেপুটি সরকার পক্ষকে সমর্থন জানালেন এবং প্রধানমন্ত্রী ম্যাকমিলানও প্রতিবাদীদের পাল্টা জবাব দিয়ে চলেছেন। এমন সময় সামনের

কাঠের দরজার ফাঁক দিয়ে দেখা গেল একটি মূর্তি। বয়সের ভারে দেহ আনত, দৃষ্টি বিহ্বল। হাতে লাঠি, পা তবু কাঁপছে।

ইনিই স্যার উইনস্টন চার্চিল। অতিকষ্টে নিজেকে ঠেলতে ঠেলতে নির্দিষ্ট আসনে এসে বসলেন। মুখে কোন অভিব্যক্তি নেই। শুধু ফ্যাল-ফ্যাল করে এদিক ওদিক তাকাচ্ছেন। কিন্তু মন দিয়ে যেন সব ঠিক শুনছেন। নইলে সময়মত খুট খুট হেঁটে ভোটটি দিয়ে এলেন কী করে?

প্রধানমন্ত্রী নেহরু নাকি একবার বলেছিলেন, কলকাতা শহরে দেখার আর কী আছে, তের তলা নিউ সেক্রেটারিয়েট আর ডাঃ বি সি রায় ছাড়া? লণ্ডনেও হাউস অব পার্লামেণ্ট আর স্যার উইনস্টন চার্চিল ছাড়া দেখার বিশেষ কিছু নেই। এক জায়গাতেই দু' জিনিস দেখা হয়ে গেল, আর এখানে থাকার কী দরকার?

হাউস অব কমন্স থেকে বাইরে বেরোতেই কী বৃষ্টি, কী বৃষ্টি! ছুঁচের মতন গায়ে বিঁধছে। মহা বজ্জাত লণ্ডনের এই পাগলা আবহাওয়া।

হাউস অব পার্লামেণ্টের সামনেই অপেক্ষা করছেন আমার গাইড মিস্টার মাইকেল কাণ্ট।

বৃষ্টি-ধোয়া লণ্ডনের বুকে গাড়ি চক্কর মারছে। বাকিংহাম প্যালেস, গ্রীণ পার্ক ঘুরে কেনসিংটন গার্ডেন, তারপরই বেজওয়াটার রোড। কুইনসওয়ে আর লাংকাস্টার গেট স্টেশনের মাঝখানে হার্টফোর্ড হোটেলে আছি, সেখানেই এক ভদ্রলোক আসবেন দেখা করতে। তাঁকে নিয়ে রাত্রে আবার অপেরা দেখতে যেতে হবে। 'এ মিড সামার নাইটস ড্রিম।' প্রযোজনা জন গিলগুডের। তার আগে খাওয়াটা সেরে যাওয়া দরকার।

কাণ্টকে নিবেদন করলুম, কোন ভারতীয় রেস্তোরাঁয় যেতে চাই।

'ইংলিশ রান্না কি তোমার ভাল লাগে না?'—কাণ্ট জানতে চায়।

'তা বাপু, ইংলিশ জার্মান সব খানাই তোমাদের সমান। আর একে রান্না বল কী করে? সেদ্ধ বা আধপোড়া একটা কিছু টেবিলে নিয়ে এল হাপিত্যেশ একঘণ্টা বসার পর। বাকি সব রান্না তো করতে হয় আমাকেই টেবিলের ওপর। লেবুর রস দাও, নুন দাও, লঙ্কার গুঁড়ো মেশাও, সস্ ঢালো, শ্যালাড্, আলু সেদ্ধ সঙ্গে লাগাও—কম ঝকমারি! তার ওপর কাঁটা চামচ নিয়ে ধস্তাধস্তি তো আছেই।'

কাণ্ট হাসে। টেকো মাথায় তিনবার সুড়সুড়ি দিয়ে পাইপে আগুন ধরায়। কাণ্ট আমাকে নিয়ে গেছে খানদানি রেস্তোরাঁয়। সিম্পসনে, বেণ্টলিতে। ওসব জায়গার খাওয়ার আভিজাত্য সালংকারে বুঝিয়েছে। আমি 'তাই নাকি, তাই নাকি' করেছি, কিন্তু মনে মনে বলেছি, 'ভায়া, আমার কাছে সব সমান, সব অখাদ্যি।'

কাণ্ট আমার অনুরোধে পড়ে শেষমেষ নিয়ে গেল সোহো পাড়ায় গ্রীক রোডের নিজাম হোটেলে। সেখানে ঢাকার ভাই শুকুর মামুদ জলিল মিঞার তৈরি চিকেন কারি আর গরগরে ভাত গোগ্রাসে গিলতে গিলতে মনে পড়ে গেল চাঁদপুর-গোয়ালন্দ সার্ভিসের ইস্টিমারে বসে মুরগির ঝোল খাওয়ার কথা। একেবারে সেই গন্ধ, সেই স্বাদ।

লণ্ডনে শ' তিনেক রেস্তোরাঁ আছে ভারতীয় খানার। বেশীর ভাগই সিলেটি মুসলমানদের। বাইরে কোট নেকটাই লাগিয়ে খদ্দেরদের কাছে 'ইয়েস স্যার', 'থাঙ্কু স্যার' বলছে, আর পর্দার আড়ালে রসুইখানায় ঢুকেই ওরা ডাক পাড়ে,—'ও মান্নান, ডাইলর বাটি দে বেটা, ছালনের বর্তন আন্। শুনেছি, তাদের অনেকেই

মেম শাদি করেছে এবং বিবিকেও সিলেটি উপভাষা না শিখিয়ে ছাড়েনি।

যাই হোক, বহুদিন পর তৃপ্তিতে খেলুম। মাংস ভাত ছাড়া মুগের ডাল, আলু ভাজা, গলদা চিংড়ির মালাইকারি, কপি মটরশুটির ডালনা, কুচো চিংড়ি আর কুমড়োর ঘণ্ট, চাটনি, আমের আচার—আহা অমৃত, অমৃত।

কাণ্টকে শুধোলুম, 'কেমন লাগল? তোমার ওই ষাঁড়ের লেজ, বাছুরের যকৃৎ, ব্যাঙের ঠ্যাঙের চেয়ে ভাল কিনা সত্যি করে বল দিকি?'

কাণ্ট বললে, 'ডিল্লিসাস।'

বুঝলুম সিম্পসনে ঢুকে আমার যে অবস্থা হয়েছিল, ওরও তাই। ঝালের চোটে 'উঃ আঃ' করতে করতে মুখে ঐ কথা বলল বটে, কিন্তু আন্দাজ করতে পারি, 'ইয়া গড্ ইয়া গড্' বলতে বলতে মনে মনে আমার তিনপুরুষের আদ্যশ্রাদ্ধ করছে।

॥ বারো ॥

অক্সফোর্ডে পৌঁছতেই হৈ হৈ ব্যাপার, সবাই ছুটছে ট্রিনিটি কলেজের মাঠে। আমার ইচ্ছে জনসনের কলেজ পেমব্রুকে যাই, লরেন্স টার্নার বলেন, 'দূর মশাই, কলেজ তো পড়েই আছে, যখন খুশি দেখতে পারেন, হেলিকপ্টার চড়া প্রিন্সেসকে দেখার সৌভাগ্য ক'টা লোকের জীবনে ঘটে।'

ব্যাপার কিছুই নয়, প্রিন্সেস আলেকজাণ্ড্রা সেদিন আশমোলিন কলেজের দূরপ্রাচ্য বিভাগ ভবনের উদ্বোধন করতে আসছেন। লণ্ডন থেকে হেলিকপ্টারে চড়ে। হেলিকপ্টার চড়া ইংলণ্ডের রাজ-পরিবারে নাকি এই প্রথম। একে রাজকুমারী, তার উপর হেলিকপ্টার, রানীভক্ত অক্সফোর্ডবাসী হুমড়ি খেয়ে পড়ল ট্রিনিটির ছোট্ট মাঠে। টার্নার সাহেবের পেছন পেছন আমিও হাজির সেই ভিড়ের মাঝখানে।

চারদিকে মাথার গিজগিজ, ক্যামেরা-ম্যান শাটারের ডগায় আঙুল উঁচিয়ে আছে, সূর্যগ্রহণ দেখার কায়দায় সবাই আকাশ চষে বেড়াচ্ছেন, প্রিন্সেস দেখতে কেমন, তাই নিয়ে গাছের তলায় গাল-গল্পও সুরু হয়ে গিয়েছে এবং অভ্যর্থনাকারীর দল টাইটা, কলারটা টিক আছে কিনা মিনিটে মিনিটে দেখে নিচ্ছেন।

প্রিন্সেসকে স্বাগত জানানো নিয়েও মহা ফ্যাসাদ। অক্সফোর্ডের মেয়র বলেন, তিনিই অভ্যর্থনা জানাবেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ নরিংটন জানান, আজ্ঞে না, সেটি হচ্ছে না, আমার কলেজের মাঠে তিনি নামছেন, অন্য কাউকে ফপরদালালি করতে দিচ্ছি নে।

শেষমেষ ডঃ নরিংটনেরই জিৎ। মেয়র গোসা করে এলেনই না, পাঠিয়ে দিলেন তাঁর এক প্রতিনিধিকে। উপাচার্য ধড়াচূড়া লাগিয়ে হেলিকপ্টারের অপেক্ষায় পাঁয়তারা কষতে লাগলেন।

যাই হোক, নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট জায়গায় হেলিকপ্টার নামল। উপাচার্য এগিয়ে গেলেন, সমবেত জনতা মাথা নোয়াল, ক্যামেরার শাটার 'ক্লিক' বলল এবং প্রিন্সেস মৃদু হেসে ডিঙিনৌকোর মত একখানা ঢাউস মোটরগাড়ি চড়ে দু' মিনিটে বেরিয়ে গেলেন।

টার্নার সোৎসাহে এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলেন, 'প্রিন্সেসকে কেমন লাগল?'

আমি বললুম, 'সাধারণ একটি ইংরেজ মহিলার মতই।'

আমার জবাবে, মনে হল, টার্নার একটু হতাশই হলেন।

ইংলণ্ড গণতন্ত্রের দেশ, কিন্তু রাজারানী নিয়ে তাঁদের মাতামাতি দেখবার মত। আলেকজাণ্ড্রা রানী এলিজাবেথের খুড়তুতো বোন, তাঁকে নিয়েই কত! এখানেও সেই ট্র্যাডিশান।

এবং এই ট্র্যাডিশানকে আঁকড়ে রাখার প্রয়াস দেখেছি অক্সফোর্ডের সব কলেজে। জেসাস, বিশপ, বেলিওল, কুইনস্, পেমব্রোক সর্বত্রই পুরোনো ধরনের বাড়ি, প্রাঙ্গণ, গির্জে, খানাঘর।

কেমব্রিজেও তাই। কেম্ নদীর পারে বিভিন্ন কলেজ। প্রতি কলেজের সঙ্গে এক-একটি গির্জে। তার কোনটি ক্রিস্টোফার রেণের অক্ষয় কীর্তি। অক্সফোর্ডের তুলনায় কেমব্রিজে অলিগলি বেশী। গলির পর গলি, তস্য গলি। অনেক বাড়িই পুরোনো, সিঁড়ি অন্ধকার, মেঝে স্যাঁতস্যাঁতে, অতীত ঐতিহ্যকে পুরোপুরি বজায় রাখার চেষ্টা সবখানে।

দেখে শ্রদ্ধা হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে আমাদের দেশের কলকাতা আর বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা। অবলীলাক্রমে সেখানে সেনেট হাউস মাটিতে গুঁড়িয়ে ফেলা হয়, শান্তিনিকেতনে

নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় 'সংস্কার' 'নাট্যঘর' 'দ্বারিক'। ষাট একশ বছরের তো ইতিহাস, তাকে সামলাতে গিয়েই আমরা হিমসিম। অক্সফোর্ড, কেমব্রিজ সাত-আট শ' বছরের জিনিস বুকে আঁকড়ে কী সুন্দর টিঁকে আছে।

কেমব্রিজে আমি অতিথি হয়েছিলুম অমর্ত্য-নবনীতার। শ্রীমান অমর্ত্যকুমার সেন কেমব্রিজের কীর্তিমান ফেলো, তরুণ অর্থনীতিবিদ, বিদেশে ভারতের মুখোজ্জ্বলকারী সন্তান।

অমর্ত্য যখন মাত্র কয়েক বছর আগে কেমব্রিজের দুর্লভ সম্মান 'স্থায়ী ফেলো' হয়ে এখানে এল, তার বয়স তেইশ কি চব্বিশ। বিভিন্ন কলেজের মাঝখানে ঘাসের যে আঙিনা আছে, তাতে ছাত্রদের হাঁটা বারণ। একমাত্র পারেন ফেলো আর অধ্যাপক। অমর্ত্য ট্রিনিটির প্রাক্তন ছাত্র, ছাত্রজীবনে ঐ ঘাসের ডগা মাড়াতে পারেনি। ফেলো হয়ে এসেই তৃণাচ্ছাদিত ঐ প্রাঙ্গণে উঠে পড়ল। দারোয়ান ছুটে এল হৈ হৈ করে। আঙুল নাড়িয়ে আপত্তি জানায়, 'ছোকরা ছাত্রদের ওখানে দাঁড়াতে নিষেধ আছে।' অমর্ত্য মুচকি হাসে।

পরে দারোয়ান অমর্ত্যের পরিচয় জেনে তিনবার স্যালুট মেরে পালাবার পথ পায় না।

সেই অমর্ত্য ঘুরে ঘুরে দেখাতে লাগল কেমব্রিজের বিশ্ববিদ্যালয়-শহর। মাঝখান দিয়ে গিয়েছে কেম্ নদী। নদী বললে অবশ্যি ব্রহ্মপুত্র-মেঘনা-গঙ্গাকে লজ্জা দেওয়া হয়, আমাদের দেশের ছোট নালার মতই। তার বুকে জোড়া জোড়া নৌকো। পুলের তলা দিয়ে, পপলার গাছের ফাঁক দিয়ে আসছে, চলে যাচ্ছে বই-হাতে নৌকায় এলিয়ে আছে আছে-কি-নেই জামা-পরা তরুণী ছেলেবন্ধুটির হাতে দাঁড়।

নদীর দু-পারে তরুণ-তরুণীর ভিড়। কারও হাতে বই, কারও মুখে পাইপ। আর গোটা নদী জুড়ে খিলখিল হাসির আওয়াজ। সেই আওয়াজে সোনালী রোদের আলোয় ঝিকমিক টিউলিপ ফুলের সারিও হেসে হেসে খুন।

সেদিন ছিল ছুটির বার।

নবনীতা নিয়ে গেল ট্রিনিটির ভেতরে। এই ঘরে ছিলেন বায়রন তাঁর পোষা ভালুক নিয়ে, এই ঘরে নিউটন। চলুন লাইব্রেরীতে যাই, সেখানে বায়রনের হাতে-লেখা প্রথম চিঠি, টেনিসনের লেখা কবিতা, নিউটনের ব্যবহার করা প্রথম টেলিস্কোপ সব দেখে আসি। নবনীতাকে জিজ্ঞেস করি, নেহরু কোন্ ঘরে ছিলেন? তিনিও তো এই কলেজের ছাত্র।

নবনীতা বলে, ঠিক জানিনে, অনেককে জিজ্ঞেস করেছিলুম, বলতে পারেনি। ট্রিনিটির লাইব্রেরীর ঘরেও নেহরুর কোনো উল্লেখ নেই।

আমার আশ্চর্য লাগল, বিদেশে যেখানে গিয়েছি, সবাই 'নেহরু' 'নেহরু' বলে পাগল। পরদেশে আমাদের সুনাম দুর্নাম সব নেহরুকে নিয়ে। শুধু যারা 'মেননজাইটিস' রোগে ভোগে তারাই সমালোচনা করেছে নেহরুকে, যারা গোয়া দখলের পটভূমিকা জানে না, তারাই গালাগাল দিয়েছে নেহরুকে। তাছাড়া মোটামুটি সকলের দৃষ্টিতে নেহরু বলতেই ভারত এবং ভারত বলতে নেহরু। অথচ ট্রিনিটির কোন্ ঘরে তিনি ছিলেন খুঁজে বের করতে হয়। বোধ হয় মদ, মাংস এবং গরীবের কথার মত বাসি না হলে কেমব্রিজ কাউকে সম্মান দেয় না।

•

অক্সফোর্ডের খানদানী 'মাইটার হোটেলে' বসেও নেহরু সম্পর্কে কথা হচ্ছিল। লাঞ্চে উপস্থিত ছিলেন সংস্কৃতের বোডেন অধ্যাপক

ডক্টর বারো, ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিট্যুটের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিষ্টার স্টুক, কমনওয়েলথ সোসাইটির অক্সফোর্ড শাখার সম্পাদক মিষ্টার লে-লো এবং অক্সফোর্ডের প্রাক্তন এম-পি মিস্টার লরেন্স টার্নার। তাঁদের মাঝখানে আমি। হংস মধ্যে বক।

স্টুক বললেন, 'নেহরুর প্রতি আমার শ্রদ্ধা অপরিসীম, বিদেশের এই একটি লোকের দিকে আমি চেয়ে থাকি। টেগোর আমি পড়েছি। আমার মতে গ্যাণ্ডির সঙ্গে নয়, নেহরুর সঙ্গে মিল টাগোরের।'

'ঠিক তাই'—আমি বলি, 'গত বছর বোম্বাইয়ে রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকীর উদ্বোধনী ভাষণে নেহরু নিজেই বলেছেন—গান্ধীজির শিষ্য বলে খ্যাত হলে কী হবে 'my mind is more attuned with Tagore.' খাঁটি কথা।

লে-লো ফোড়ন কাটেন, কৃষ্ণ মেননকে বাদ দিলে নেহরুর তুলনা নেই।

আবার মেননজাইটিস! রাজনীতির ঘোলাজলে আলোচনার চক্কর মারার ভয় আছে আন্দাজ করে আমি কথার মোড় ফিরাই। ডক্টর বারোকে প্রশ্ন করি সংস্কৃতকে ভারতের রাষ্ট্রভাষা করা সম্পর্কে তাঁর কী মত?

ডক্টর হাসলেন, বললেন, 'না তা হয় না, সংস্কৃত ডেড ল্যাঙ্গুয়েজ নয় বটে, তেমনি সর্বজনবোধ্য ভাষাও নয়। তাকে রাষ্ট্রভাষারূপে চালাতে গেলে নতুন বিপত্তি দেখা দেবে।'

টার্নার ছিলেন আমার বাঁ-পাশে। ডান ভুরু দেড় ইঞ্চি কপালে তুলে ন্যাপকিন দিয়ে ঠোঁটের ডগা আলতো মুছতে মুছতে বলেন, 'আপনারা ইংরাজীকে বরখাস্ত করতে চান নাকি?'

আমি তৎক্ষণাৎ বলি, 'দেখুন বরখাস্ত করার প্রশ্ন নয়, আদত কথা আমার নিজের একটা ভাষা চাই। ইংরাজীর প্রতি আমাদের বিদ্বেষ নেই, বরং ইদানীং তার প্রেমে হাবুডুবুই খাচ্ছি, তাকে

কখনও তালাক দেব না। কিন্তু তার স্থান দ্বিতীয়, প্রথম হবে আমার নিজের ভাষা—যার মারফৎ বিদেশে এসে যে-কোন ভারতীয়ের সঙ্গে কথা বলতে পারি।'

স্টুক বলেন, 'তার মানে?'

'একটা ঘটনা বলি'—আমায় তখন কথায় পেয়েছে—'বার্লিনে আমাদের কন্সাল জেনারেলের সঙ্গে দেখা করতে গেছি। মিস্টার দামোদরণ ঐ পদে নতুন এসেছেন। তিনি কেরলের লোক, আমি বাংলার। তাঁর সঙ্গে দেখা হতেই অস্বস্তিতে পড়লুম। আমরা কোন্ ভাষায় কথা বলব? ইংরেজী, জার্মান, না হিন্দী? হায় ভগবান, আমরা দুজনেই ভাল হিন্দী জানি নে; দামোদরণ জানেন না বাংলা, আমি জানি নে মালয়ালম। শেষ পর্যন্ত ঐ ইংরাজীই ভরসা। কিন্তু লক্ষ্য করলুম, যখনই দূতাবাসের কোন জার্মান কর্মচারী আমাদের আলোচনার মাঝখানে চা নিয়ে বা ফাইল নিয়ে হাজির হয়েছেন, দামোদরণ তক্ষুণি হিন্দীতে কথা বলার চেষ্টা করেছেন, এবং আমিও ভাঙা হিন্দীর আশ্রয় নিয়েছি। একজন ইংরেজ বা জার্মানের সামনে বিদেশী ভাষায় দুই ভারতীয়ের কথা বলা কী লজ্জার আপনারা আন্দাজ করতে পারবেন না।'

ডক্টর বারো—'কেন পারব না, আমি আপনার দুঃখটা কোথায় বুঝতে পারি। তবে ভারতে গিয়ে কয়েকজন লোকের সঙ্গে আলাপ করে কিন্তু আমার অন্য রকম ধারণা হয়েছিল।'

'হতে পারে'—আমার জবাব—'তবে আমার বিশ্বাস, ওরা মুষ্টিমেয় কয়জন। মোট কথা, আমাদের একটি সর্বজনীন ভাষা চাই, এবং আমার মতে কালে হিন্দীই সে স্থান দখল করবে। অবশ্যি আমার নিজের মাতৃভাষা থাকবে শিক্ষার বাহন আর ইংরেজী হবে বিদেশী সাহিত্য-সংস্কৃতির জানালা।

সেদিনই রাত্রে স্ট্র্যাটফোর্ড-অন্-এভনে 'এ মিড সামার নাইটস ড্রিম' দেখে ফেরার পর রেড হর্স হোটেলের লাউঞ্জে বসে মিস্টার আলফ্রেড ইভান্সও আমার মনের এই কথাটি আবার বলেছিলেন। রবি বর্মার আঁকা 'মেনকা-বিশ্বামিত্র' ছবিতে বিশ্বামিত্রের সেই পরিচিত ভঙ্গীর মতই এক হাত শূন্যে নাড়াতে নাড়াতে উত্তেজিত ইভান্স বললেন, 'না না, ইংরাজীকে আপনাদের রাষ্ট্রভাষা কিছুতেই করবেন না। ইংরাজী শিখুন, কিন্তু রাষ্ট্রভাষা হবে আপনাদের নিজেদের। যেমন আমার পয়লা নম্বরী ভাষা ওয়েলশ, ইংরাজী তার পরে।'

ইভান্সের বাড়ি ওয়েলশে।

তেরো ॥

গাইড তো নয়, এক একটি সাক্ষাৎ হরিনাথ দে। ফ্রেঞ্চ, জার্মান, সোয়েডিশ, ইতালিয়ান গড়গড় বলে যাচ্ছে। তদুপরি সবাই গুলে খেয়েছে বীরবল গোপাল ভাঁড়কে। মুখখানা একেবারে রসের গামলা, গড়িয়ে পড়ছে তো পড়ছেই।

এমনি এক গাইডের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল প্যারিসে। কাচে মোড়া ট্যুরিস্ট বাস প্লাস দ্য লা মাদলীন থেকে ছাড়তেই মার্কিন দলবলটি গাইডের জবানীতে—'বাফেলো' আমার পাশে বসা ইতালিয়ান সেনোরিতা 'জিনা' এবং সবেধন নীলমণি ইণ্ডিয়ান আমি 'নেহরু'। বিদেশে, আগেই বলেছি, নেহরু মানেই ইণ্ডিয়া এবং ইণ্ডিয়া মানেই নেহরু।

আর 'জিনা'? ড্রাইভারের পাশের সীট থেকে উঠে এসে এবং হাতের মাইকটি মুখের কাছ থেকে সরিয়ে গাইড বললে, 'জানো না বুঝি? দান্তে, রাফেল সব বরবাদ, ইতালির এখন একমাত্র পরিচয় জিনা লোলোব্রিজিডা। তোমাদের যেমন তাজমহল, লণ্ডনের যেমন বিগবেন, আমাদের ঈফেল টাওয়ার, ইতালির তেমনি জিনা লোলোব্রিজিডা।'

বলেই গলা ফাটিয়ে হো-হো হাসি। ইতালিয়ান সঙ্গিনীটিও মুচকি হাসেন। ঠোঁটের ডগা থেকে দু'কদম এগিয়ে নিটোল গালের কাছে আসতে না আসতেই সে হাসি হাওয়া।

গাইড চার পা পিছিয়ে সামনের দিকে খানিক ঝুঁকে গাম্ভীর্যের ভাণ মুখে এনে বলে, 'মাননীয় ভদ্রমহিলা এবং ভদ্রমহোদয়গণ, বাসনা ছিল সেইন নদীর পারে লুভর্ মিউজিয়ামে আপনাদের নিয়ে গিয়ে

মোনালিসার ভুবনমোহন হাসিটি দেখাই। এখন ভাবছি তার দরকার নেই, কোণের আসনটিতে বসা 'সেনোরিতাকে' দেখে নিলেই আপনাদের কাজ চলে যাবে, চেয়ে দেখুন একেবারে মোনালিসা-স্মাইল।'

আবার একদফা হাসি। মেয়েটি লজ্জায় গোলাপী।

গাইড দু-পাশের দ্রষ্টব্যের বর্ণনা দিয়ে চলেছে। 'এই হচ্ছে প্লাস দ্য লা কর্কর্দ, এটাই সাঁজেলিজে, সামনে দেখা যাচ্ছে অচেনা সোনার স্মৃতি 'আর্ক দ্য ত্রিয়াফ', খানিক পরেই ছোট দ্বীপের মাঝখানে নৎরদাম গির্জে। তার আগে দাঁড়ান, ঈফেল মিনারের কোল ঘেঁষে যাওয়া যাক। আর হ্যাঁ, সুইসাইড করার সখ যদি কারও থাকে বলুন, বাসটা খানিক দাঁড় করাই, মিনারের ডগায় উঠে অনায়াসে ঝাঁপ দিতে পারেন। আমার জানামত এ পর্যন্ত ঈফেল মিনার থেকে ঝাঁপিয়ে মোট ৩৬৭ জন শহীদ হয়েছেন। সংখ্যাটা যদি কেউ বাড়াতে চান নামটা বলুন, নোটবুকে টুকে রাখছি।'

মুখ তো নয়, জ্বলন্ত কড়াই, টগবগ খই ফুটছে। আমার ছিল ইংলিশ স্পীকিং বাস। তাই প্রথমে ইংরেজী ঝড়, তারপর দুটি জার্মান দম্পতির জন্যে জার্মান আর সেই ইতালি-তনয়ার জন্য ইতালিয়ান।

ততক্ষণে ঘুরতে ঘুরতে আমরা অ্যাভালিদ-এ নেপোলিয়ানের কবরের কাছাকাছি এসে গেছি। টিকিট কেটে ভেতরে ঢুকতেই কবরের দোরগোড়ায় এক ঢ্যাঙা ভদ্রলোক। গাইড বলে, 'দেখ, দেখ, যেন ঈফেল টাওয়ার, গোটা দরজাটা আটকে রেখেছে।'

মজার মজার কথাবার্তা শুনে গাইডটি সম্পর্কে আমার কৌতূহল বেড়ে গেল। এক ফাঁকে জিজ্ঞেস করলুম, 'কটি ভাষা জানেন?'

'চোদ্দটি। এখন জাপানী শিখছি।'

'হিন্দী?'

'ইণ্ডিয়ান ল্যাংগুয়েজ? আদৌ না, তবে শেখার ইচ্ছে আছে।'

আবার বাসে। আবার চক্কর এবং অবিশ্রাম রাণিং কমেণ্টারি। পাক্কা চার ঘণ্টা ঘুরপাক খেয়ে যখন বিদায় নেব ভাবছি, এগিয়ে গেলুম গাইডটির কাছে। বললুম, 'আপনার সঙ্গে কোথায় দেখা করা যায় বলুন তো?'

'কী দরকার?'—তুড়ি মেরে সিগারেটের ছাই ঝাড়তে ঝাড়তে নির্লিপ্ত কণ্ঠে জবাব দেয়।

'এই একটু গল্পগুজব করা'—আমার চোখেমুখে বিনয় গলে গলে পড়ছে।

'ঠিক আছে, আসুন ছত্রিশ নম্বর আভেন্যু দ্য লোপেরায়। চারটে নাগাদ, তখন ফ্রি আছি। আচ্ছা, আদিয়ে।'

গাইড চলে যেতেই আমিও ফিরলুম হোটেলে। লাতিন কোয়ার্টারে বিশ্ববিদ্যালয় মহল্লায় রু জাকব নামধারী ছোট রাস্তায় ততোধিক ছোট হোটেল। জার্মান সরকার আর ইংলণ্ডেশ্বরীর ঢালাও আতিথ্যে এতদিন ছিলুম 'লবাবপুত্তুর', বরাবর খানদানী হোটেলে-রেস্তোরাঁয় নবাবী করে এসেছি, প্যারিসে এসে গুণতে হচ্ছে গাঁটের ফ্রাঙ্ক। তাই চলছি সাবধানে, গুণে গুণে পা ফেলে।

কিন্তু হোটেল দেখেই মেজাজ তিরিক্ষি। লিফট নেই, লাগোয়া বাথরুম নেই, গড়ের মাঠী লাউঞ্জ নেই, বিছানার কাছে টেলিফোন পর্যন্ত নেই। আর বিছানাটিও মাখনের ডেলা নয়, চাদর কুঁচকে আছে।

তৎক্ষণাৎ ভুরুটাও কুঁচকে গেল। বেড-ব্রেকফাস্টে হয় রাত তেইশ নয়া ফ্রাঙ্ক গুণেও এই হাল! ধ্যুৎতেরি।

ঘন্টি টিপেই বা কী লাভ। বুড়ি ঝি ছুটে এসে 'উয়ি মঁসিয়ে' এবং 'মের্সি মঁসিয়ে'র ফোড়ন দিয়ে বিড়বিড় করে কী যেন ছাইপাঁশ বলে যাবে, ঠাওরই করতে পারব না। এমন 'অশিক্ষিত' জায়গা, ইংরেজী পর্যন্ত বলতে পারে না।

গটমট করে আবার পথে বেরিয়ে পড়লুম। হাতে দু' ঘণ্টা সময়। ঘুরতে ঘুরতে সময় কাবার করে চারটেয় যাওয়া যাবে গাইডের দেওয়া ঠিকানায়। আগে ভেবেছিলুম অমিত রায় কেটি মিত্তিরের মুখে শোনা 'মনামি' আর সত্তোলব্ধ 'আশাঁতে' শব্দ দুটি সম্বল করে কোন ফরাসিনীর সঙ্গে ভাব জমাব, এসে দেখছি, সে 'কেকে' বালি। আমার ফরাসী ওদের কাছে 'গ্রীক' এবং জিনিসপত্র খাবারদাবারের যা পিলেকাঁপানো দর, ফুর্তিফার্তির দুরাশা শিকেয় তুলে তার চেয়ে ঢের ভাল সেই গাইডের সঙ্গে আড্ডা মারা।

রু বোনাপার্ত উজিয়ে এক ফার্লং এগোলেই সেইন নদী। পঁ রইয়াল ধরে নদী পেরোতেই লুভরের বিরাট আঙিনা। তার তলায় খানিক উঁকিঝুঁকি মেরে রু দ্য রিভোলি। সেখান থেকে তেরচা হয়ে বেরিয়েছে অ্যাভন্যু দ্য লোপেরা। মোড়েই ছত্রিশ নম্বর বাড়ি। সেই বাড়িই লাফি তুরিজম। আমার সেই গাইডের অফিস।

দেখি বিরাট সোফায় গা এলিয়ে উত্তর-পঞ্চাশ ছোটখাট মানুষটি সিগারেট মুখে বসে আছেন। অফিসে আর কেউ নেই। ঢুকতেই সোফা থেকে শোনা গেল—'এই যে, নেহরু এসে গেছ!'

পাশের সোফায় বসতে বসতে জিজ্ঞেস করলুম, 'মহাশয়ের নামটি তো জানা হয়নি।'

'মায়েরোভিচ, সবাই ডাকে 'লিটল জ্যাকি।'

'নামটা তো র‍্যাশ্যান র‍্যাশ্যান মনে হচ্ছে।'

'না, আমার বাড়ি ছিল পোল্যাণ্ড।'

'এখানে কী করে?'

'সে এক ইতিহাস। অনেক দেশ ঘুরে ঘুরে এখানে টিঁকে গেলুম। প্যারিসের প্রত্যেকটি রাস্তাই যে এক এক ভল্যুম ইতিহাস! এই ইতিহাসের সঙ্গে নিজেকে ভাসিয়ে দিলুম।'

লিটল জ্যাকি থামতেই আমি বলি, 'গোড়া থেকে শুরু হোক।'

গাইড নড়েচড়ে বসলেন। আমার দেওয়া ফিলটার সিগারেটটি লাইটারে ধরিয়ে বললেন, 'এই টেলিভিশনটাই আমার সর্বনাশ করে দিলে।'

'তার মানে?'

'মানে আবার কী হবে, ছিলুম শো বিজনেসে, গড়াতে গড়াতে হয়ে গেলুম ট্যুরিস্ট গাইড।'

'অর্থাৎ?'

'দাঁড়াও, বলছি। ১৯২০ সালে এসেছি প্যারিসে, তখন আমার বয়স বারো। ততদিনে 'আই অ্যাম অলরেডি ফানী।' ছোটবেলায় মা বাবা হারিয়ে ওয়ারশ থেকে পালিয়ে এলুম। যোগ দিলুম এক অর্কেস্ট্রা পার্টিতে। তারপর দশ বছর পুরতে না পুরতেই নিজের শো বিজনেস। নাম হল 'লিটল জ্যাকি ব্যাণ্ড অ্যাণ্ড হিজ বয়েজ'। তখন থেকে আমার পরিচয় লিটল জ্যাকি। স্টেজে হাসি ঠাট্টা ভাঁড়ামি করি, রাতের পর রাত হাততালি কুড়াই। ডাক পড়ে নানা দেশ থেকে। ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা, উরুগুয়ে,

ভেনজুয়েলা, মেক্সিকো ; মার্কিন দেশ ঘুরে ফের প্যারিস। ততদিনে বিখ্যাত লোক। লিটল জ্যাকি বলতে সবাই পাগল। ১৯৩৭ সালে গেলুম লণ্ডন। সেখানে আর একদফা জনপ্রিয়তা। সিনেমায়ও কমিক রোলে নামলুম। তারপর লাগল যুদ্ধ। 'পোলিশ' বলে নিয়ে গেল কনসেনট্রাশন ক্যাম্পে—জার্মানীর 'ডাহাউ' নামে জায়গায়। ক্যাম্প থেকে পালিয়ে সোজা সোয়েডেন। গা ঢাকা দিয়েছিলুম অনেক দিন। যুদ্ধ থামলে পর আবার 'আউট অব নাথিং' সবাইকে হাসাতে শুরু করেছি। স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান দেশগুলোতে ব্যবসা জমে উঠল। সেখানে কয়েক বছর কাটিয়ে পুরো চার বছর জার্মানীতে। ততদিনে চৌদ্দটি ভাষাও শিখে ফেলেছি।

'আচ্ছা, এতদিন তো ঘুরলেন, আপনার মতে কোন্ দেশ সব চেয়ে ভাল হিউমার বোঝে ?'—আমি প্রশ্ন করি ?

'হিউমার ?'—লিটল জ্যাকি জবাব দেন, 'আমার ধারণা, ডেনমার্ক, তারপর ইংল্যাণ্ড।'

'ফরাসীরা ?'

'আরে দূর দূর, ডেনিশদের কাছে কেউ না। হ্যাঁ, যা বলছিলুম। আমার কপাল পুড়ল তিন বছর আগে, ১৯৫৯ সালে। দলের ম্যানেজার একদিন এসে বললে—ব্যবসা বন্ধ করে দেব, আর চলছে না। টেলিভিশনের বাজার এখন। শো বিজনেসের দিন নেই। পড়লুম অকূল পাথারে। বুড়োও হয়ে যাচ্ছি। প্যারিসের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াই। তখনই এক বন্ধু এসে বললে 'লাফি'তে যোগ দাও, টাকা পাবে। জিজ্ঞেস করলুম কী কাজ ? বললে, অনেক ভাষা জানো তো, তাই গাইডের কাজ। মা মেরী বলে ঝুলে পড়লুম। এখন বেশ আছি, তোমাদের মত বোকা বিদেশীদের চরিয়ে দু' পয়সা পাই।'

'এ কাজ ভাল লাগে ?' ফের প্রশ্ন।

'মোটেই না, আমার মন পড়ে আছে শো বিজনেসে। গতকাল রাত্রে একদল ট্যুরিস্ট নিয়ে গিয়েছিলুম মুল্যাঁ রুজে। স্টেজে একটি লোক হাসাচ্ছিল। ছোকরা কায়দা ভালই জানে। কিন্তু কী বলব, আমার তখন ভীষণ কান্না পাচ্ছে। আমারও তো ঠিক ঐভাবে স্টেজে দাঁড়ানোর কথা ছিল—'

লিটল জ্যাকি হঠাৎ থেমে গেলেন। মিনিট দুই পরে বলেন, 'যাক্‌গে ওসব কথা, যাবে নাকি আজ মুল্যাঁ রুজে? আমিই দল নিয়ে যাব।'

॥ চৌদ্দ ॥

ক্লোটেন এয়ারপোর্ট থেকে সোজা টার্মিনালে এসে চেহারাছবি দেখে মনে হল ফের জার্মানিতে পা দিয়েছি। 'রোড', 'স্ট্রীটের' বদলে ফের 'স্ট্রাসে', ফের 'প্লাৎস্'। পথে বেরোলে আবার সেই বিজ্ঞপ্তি—'আইন গাং' (বের হবার পথ), 'উমলাইটুং' (ঘুরে এস), 'আইন-বাহ্‌ন স্ট্রাসে' (একমুখী রাস্তা)। লোকজনের চেহারাও গাট্টাগোট্টা, গাব্দাগোব্দা। ভাষায় সেই জার্মান খটমটী। তফাৎ গলার মোলায়েমী ঢঙে। অর্থাৎ 'গুটেন টাগের' বদলে 'গুতেন তাগ', 'ডাস বোডেনের' জায়গায় 'দাস বোদেন'।

এদিকটা জার্মানভাষী। জেনেভার দিকে ফরাসী চল, লুগানোর দিকে ইতালিয়ান। কুলীন ব্রাহ্মণের গাদা গাদা বউয়ের মত সুইজারল্যাণ্ড তিন তিনটে ভাষা সামাল দিচ্ছে।

কখনও কখনও শোনা যায় দুটি ভাষার জগাখিচুড়ি। ট্রেনে চলেছি বাজেল—ফ্রান্স, জার্মানি সুইজারল্যাণ্ডের ত্রিবেণী সঙ্গমে। টিকিট চেকার কামরায় ঢুকে বলল, 'গুতেন মর্গেন', বিদায় নেবার সময় জানাল—'আদিয়ে'।

অনেক সময় আরও মেশাল। জার্মান 'ডাংকেশ্যোন' আর ফরাসী 'মের্সিবুকু' মিলিয়ে কোন কোন সুইস বলে 'ডাংকেবুকু'। আমাদের বাংলা ভাষার 'হেড-মৌলবী', 'বুক-পকেটের' চেয়ে এক কাঠি বাড়া।

প্যারিশ থেকে এসেছি জুরিখ—সুইজারল্যাণ্ডের সেরা শহর, টুরিস্টদের কাশী-মক্কা।

পাহাড়ের কোল ঘেঁষে সারি সারি বাড়ি। দু'পা উঠে তিন পা নামতে হয়। শহরের বুক চিরে এঁকেবেঁকে গিয়েছে লিমাট নদী। এক পাশে পেল্লাই লেক। ঐ সবুজ পাহাড়ের চূড়ো থেকে লেকের নীল জলে লাফ দিয়ে আত্মহত্যা করেও বুঝি আরাম। আর স্পীড্‌বোট ভাড়া করে কোন সঙ্গিনী নিয়ে যদি জুরিখ লেকে চক্কর মারি, তাহলে তো কথাই নেই, বুকে স্রেফ একখানা দেড় গজী চাকু।

লেকের পারেই ওরা সব অপেক্ষা করছিল। বাহ্‌নহোফ্‌ স্ট্রাসে বরাবার এগিয়ে ব্যুকলি প্লাৎস্‌। বাঁয়ে মোড় ঘুরে জুরিখের চৌরঙ্গী, 'বেলেভ্যু'। আরও দু'কদম সামনে বিরাট পার্ক। সেখানেই সূর্যঘড়ির পাশের বেঞ্চিতে নরক গুলজার। কে বলবে সুইজারল্যাণ্ড, যেন কলকাতায় ঢাকুরিয়া লেকের পারে আড্ডা বসেছে। জেনেভা, লুৎসার্ন, বাজেল ঘুরে আড্ডায় আমিও সেদিন হাজির।

দলের সবাই বাঙালী। সবাই ইঞ্জিনিয়ার। ঘোষ, বিশ্বাস, রায়চৌধুরী, সেনগুপ্ত, চৌধুরী, মিত্তির। কেউ কাজ করে ব্রাউন বোভারিতে, কেউ স্পেখার উণ্ড শুতে। বাডেন, বুখ্‌স্‌, আরাউ, রাইদেন, সব জায়গা থেকে ঝেঁটিয়ে এসে মিলেছে।

দল বেঁধে যাব রাপার্সভিল। ছোট্ট স্টীমারে। ঘোষ বললে, 'সান্যাল, যাও তো, স্টীমার ছাড়ার সময়টা জেনে এসো তো।'

'না বাবা, আমি যাচ্ছিনে, মি-মি-মিত্তিরকে পাঠাও,'—সান্যালের সাফ জবাব।

সান্যাল একটু তোৎলা। কথা বলতে গেলেই জিভ আটকে যায়। শুনেছি, লিখতে গেলেও সে তোৎলামি করে, ত'-এর ফুটকিতে নিব ঘোরে।

'সান্যালের কাণ্ড জানো না বুঝি'—প্রবীর ঘোষ টাকে দুবার হাত বুলিয়ে বলে, 'মাস দুই আগে ওলটেন বাহ্‌নহোফে—থুড়ি, রেল স্টেশনে ও গার্ডকে ধরে মেরেছিল আর একটু হলে। আমরা তখন নতুন এসেছি। সান্যাল নতুন। অনেক কষ্টে খুঁজে পেলুম ইংরেজী জানা গার্ড। লুৎসার্ন যাব, তার ট্রেন কতক্ষণ স্টেশনে দাঁড়াবে জানতে সান্যাল-ই এগিয়ে গেল, 'হা—হা—হা—উ' ইত্যাদি হাউমাউ করে বোঝাল ব্যাপারটা। গার্ড বললে—টু-টু-টু, টু-টু-টু।'

সান্যাল রেগে কাঁই। চোখমুখ পাকিয়ে বলে, 'ভেংচাচ্ছেন কেন মশাই ?'

গার্ড আবার বললে, 'ঠিকই তো বলেছি টু-টু-টু টু-টু-টু।'

বলেই চলে গেল। সান্যাল তখনও গজরাচ্ছে—'তোৎলা বলে আমাকে ভেংচাবে ?'

'ভেংচাল কোথায় ?' আমি হাসতে হাসতে সান্ত্বনা দিই—'ঠিকই তো বলেছে। বলেছে গাড়ি থামবে দুটো বাজতে দু' মিনিট থেকে দুটো দুই পর্যন্ত।'

সকলের উচ্ছ্বসিত হাসির মাঝখানে সান্যালের গলা শোনা যায়—য—য—য—য—। অর্থাৎ কিনা, যত সব বাজে কথা, আমার ঘাড়ে অন্যের গল্প চাপাচ্ছ।

বিশ্বাস বলে—ওই হল, তুমি আমাদের বলদেব সিং।

স্টীমার ছুটেছে রাপার্সভিলের দিকে। ডেক ভর্তি টুরিস্ট, বেশীরভাগ মার্কিনী। কাঁধে ক্যামেরা, চোখে বাইনাকুলার, পকেটে নোটবুক। এপার ওপার রোজ যাতায়াত করে এমন কিছু সুইস ডেলি প্যাসেঞ্জারও রয়েছে।

দাঁড়ের ঘায়ে লেকের জল ছলাৎ ছল। দু' পাশে ছোট ছোট শহর, গাঁ। পাড়ে কেউ বসেছে মাছ ধরতে, কেউ বান্ধবীকে

বগলদাবা করে বসে আছে জলে পা ডুবিয়ে। জুরিখ শহর ক্রমে দূর, ক্রমে ঝাপসা। পেছন ফিরলে ওই উঁচুতে দেখা যায় ড্যাবড্যাব চোখে তাকিয়ে আছে অভিজাত হোটেল 'দল্‌দার'।

এদিকে আমরা এক কোণে বঙ্গভাষায় কিচিরমিচির চালিয়ে যাচ্ছি। আমাকে পেয়ে ওরা সব্বাই ক্ষুধার্ত হায়েনা। দেশের খবর ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাবে।—'বৃষ্টি পড়লে কলকাতার রাস্তায় এখনও জল জমে?'—'বিধান রায়ের পর চীফ্ মিনিস্টার কে হবে?'—'আচ্ছা, দেশে ফিরলে চাকরিবাকরি মিলবে তো'—'দূর ছাই, আর ভাল লাগে না, আপনার সঙ্গে চলেই যাই।'

সেনগুপ্ত তৎক্ষণাৎ ফোড়ন কাটে, 'ব্যানার্জি, খুব তো বলছ চলে যাবে, এনিটা রানীর তাহলে কী উপায়? নাকি দুজনেই—'

সেনগুপ্তের কথা শেষ হতে না হতেই অন্য কোণ থেকে হঠাৎ গানের আওয়াজ :—'কালকুট্টা লীগ্ ট্ আম্ গাঙ্গেস, পারী আম সেইন—।'

এদিককার একটি জনপ্রিয় গান। কলকাত্তাইদের দেখেই বোধ হয় সুইস মেয়েগুলোর রস উথলে পড়েছে। রেলিং ধরে কোরাস ধরেছে, আর আড়চোখে আমাদের দিকে তাকিয়ে দুষ্টুমির হাসি হাসছে। গানটির পদ কিন্তু চমৎকার—'গঙ্গানদীর পারে শহর কলকাতা, সেইনের পারে প্যারিস।'

আমরাই বা তাহলে পিছিয়ে পড়ে কেন? দলের একমাত্র বঙ্গললনা, নামকরা রবীন্দ্র-সংগীত শিল্পী ঘোষজায়াকে বললুম, 'ধর না তুমিও।'

বনানী সারাক্ষণ অন্যান্য যাত্রীদের একমাত্র লক্ষ্যবস্তু হয়ে আছে। কেন না, তার পরনে শাড়ি। শাড়ি পরা মেয়ে পথে-ঘাটে

দেখলে এখানকার লোকেরা তিনবার হুঁচোট খায়, পাঁচবার ঢোক গেলে।

স্টীমার একটি স্টেশনে থেমে আবার চলেছে। আমার কথায় সবাই সায় দিলে।—'হ্যাঁ, হ্যাঁ, গান হোক, রবীন্দ্র-সংগীত।'

বনানী খানিক আমতা আমতা করে গান ধরতে যাবে, হঠাৎ মনোজ্ঞ চৌধুরীর হেঁড়ে গলা—'আকাশে বিজলী হানা, বুক হইল মোর ফানা ফানা, বুকের কাপড় হাওয়ায় উড়াইয়া নিল রে—'

'কর কি, কর কি'—মিত্তির চেঁচিয়ে উঠল—'ওসব কী অশ্লীল কথা চালাচ্ছ, সঙ্গে ভদ্রমহিলা আছেন না?'

চৌধুরী গান থামিয়ে পাল্টা জবাব দেয়, 'বাঃ রে, অশ্লীলটা কোথায় হল? উত্তরবঙ্গের কোন অখ্যাত পল্লী-কবি লিখলেই অশ্লীল, আর তোমাদের রবিঠাকুর যখন লেখেন, 'বুকের বসন ছিঁড়ে ফেলে দাঁড়িয়েছে ঐ প্রভাতখানি'—তখন তো সবাই আহ্লাদে আটখানা। যত দোষ নন্দ ঘোষেরই।'

অকাট্য যুক্তি। চৌধুরীকে বাদ দিয়ে আমরা তখন বনানীকে গান গাওয়ার জন্যে পীড়াপীড়ি শুরু করেছি। বনানী গাইবে কি গাইবে না ভাবছে, এমন সময় মিত্তির বলে, 'তাহলে টেপ রেকর্ডার বাজাই।'

মিত্তির টেপ রেকর্ডার সঙ্গে নিয়ে এসেছে। এখানে যে ক'জন বাঙালীর সঙ্গে দেখা হয়েছে, সবারই আছে একটি করে। নির্মলেন্দু চৌধুরী, কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, সুচিত্রা মিত্রের গানে বোঝাই। কেউ কেউ আবার পুরো 'শ্যামা', পুরো 'চিত্রাঙ্গদা,' রেকর্ড করে রেখেছে। একজন দেশ থেকে এনেছে, অন্যরা তা থেকে তুলেছে।

মিত্তির টেপ রেকর্ডারের চাবি প্রায় খুলতে বসেছিল। আমি আপত্তি করি—'না, ওসব রেকর্ড ফেকর্ড নয়, সোজাসুজি খালি

গলার নয়। 'আহা মরি' গলার এমন গাইয়ে সঙ্গে রয়েছে, টেপ-রেকর্ডারের কী দরকার?'

'খুব তো বলছেন, টেপ-রেকর্ডারের কী দরকার জানলে বলতেন না'—প্রবীর ঘোষ আবার টাকে হাত বুলিয়ে বলে, 'গত মাসে ছিল বিশ্বাসের বিয়ে, আরাউয়ের গ্রেটলির সঙ্গে পুরোদস্তুর হিন্দু মতে। হোটেল হেলভেশিয়ার একটি ঘর ভাড়া করে সব ব্যবস্থা করলুম। তেলসিঁদুর, ধানদুর্বো, কলাপাতা, মঙ্গলঘট—সব। চার হাত উঁচু বালি বিছিয়ে হোমেরও ব্যবস্থা হল। কিন্তু পুরুত? তাকে কোথায় পাই? পুরুত না পেলে তো সব আয়োজন মাটি। ব্যানার্জিকে জিজ্ঞেস করলুম, বিয়ের মন্ত্রতন্ত্র জানে কিনা, সে হেসে উড়িয়ে দিলে।

মহা ফ্যাসাদ। শেষমেষ খোঁজ পাওয়া গেল জেনিভাতে রামকৃষ্ণ-মিশনের এক স্বামীজি আছেন, তিনি হয়ত কাজ চালাতে পারবেন। ট্রাংক-কল করা হল। স্বামীজি জানালেন তাঁর পক্ষে অসম্ভব। একে অব্রাহ্মণ, তদুপরি মাদ্রাজী। মন্ত্র মিলবে না। সঙ্গে সঙ্গে অবিশ্যি বললেন, জেনিভার ভারতীয় দূতাবাসে 'ঘটক' বলে এক ভদ্রলোক আছেন, তিনি ব্যবস্থা করে দিতে পারেন।

ফের ট্রাংক-কল। ঘটক হেসে বলেন, 'না মশাই, পারব না, 'ঘটক' পদবী বলে বিয়ের সব কিছুই আমি জানব নাকি?'

আমরা বিশ্বাসের বন্ধুরা পড়লুম অথৈ জলে। এখন কী করা যায়? হঠাৎ খবর পেলুম বোসের। বোস বাডেনে থাকে, কিছুদিন আগে বিয়ে করেছে। সে নাকি দেশ থেকে বিয়ের মন্ত্রের একটি স্পুল টেপ-রেকর্ড করে আনিয়েছে। ব্যস, কেল্লা ফতে! বাডেন থেকে আনা হল সেই স্পুল। হোটেল হেলভেশিয়ার ঘরে ধুতি-পাঞ্জাবী পরা বিশ্বাস এবং শাড়ি-ব্লাউজ পরা গ্রেটলি বসল হোমের আগুনের সামনে। রুবি, মানে আমার ওয়াইফ বনানী ধান-দুর্বো

দিয়ে করলে আশীর্বাদ, আমি শাঁখের বদলে বাজালুম বিউগল, আর টেপ-রেকর্ডে বাজতে লাগল—'যদিদং হৃদয়ং মম'—ইত্যাদি।

ভালয় ভালয় বিয়েটা চুকে গেল। এই টেপ-রেকর্ডার না থাকলে বিশ্বাস হয়ত বিবাগীই হয়ে যেত।'

প্রবীর থামতেই আমি বলি, 'হ্যাঁ, বিয়ের মত বিয়ে বটে, এমনটি আর শুনিনি। তবে আর নয়, এবারে গান।'

বলতে না বলতে গান শুরু। 'আমার দিন ফুরাল ব্যাকুল বাদল সাঁঝে।'—সন্ধ্যার জুরিখ-লেক, এলোমেলো বাদল হাওয়া আর সহযাত্রী সব বিদেশীকে চমকে দিয়ে রবীন্দ্র-সংগীতের কয়েকটি কলি।—'কোন দূরের মানুষ যেন এল আজ কাছে, তিমির আড়ালে নীরবে দাঁড়িয়ে আছে—'

সব স্তব্ধ। লেকের জল, স্টীমারের যাত্রী, দূরের আকাশ।

আমরা ততক্ষণে কেউ আর এখানে নেই। আল্পস, ভূমধ্যসাগর, সাহারা মরুভূমি ডিঙিয়ে মনপবন উধাও হয়েছে দূরে। হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোনখানে,—সুপারি-নারিকেল-তাল-তমাল-কলাগাছে ছাওয়া, বাদল অন্ধকারে ঢাকা এক আশ্চর্য জগতে, বাংলাদেশে।

॥ পনের ॥

• কার ল্যাণ্ডলেডি কত খাণ্ডার, কত ছিটেল—তাই নিয়ে কথা হচ্ছিল। ভোরবেলা জোরে হাঁচি দেওয়ার জন্যে কাকে বাড়ি বদল করতে হয়েছে, মেয়েবন্ধুর বেশী চিঠি আসার অপরাধে কে বাড়িছাড়া—ইত্যাদি ইত্যাদি হরেকরকম ট্র্যাজিক কাহিনী আড্ডাটি বিষাদমন্থর করে তুলেছে।

এমন সময় সান্ন্যাল বললে, 'আমার ল্যাণ্ডলেডি ভাই বেশ দিল-দরিয়া ছিল, জুতো সাফ করে দিত, শার্ট ইস্ত্রি করত, ব্রেকফাস্ট ডিনারেও ডাক দিত, কিন্তু আমার একটি মন্তব্যে সব গুবলেট হয়ে গেল, চার ঘণ্টার নোটিশে আমি আবার রাজপথে। ভাগ্যিস ব্যানার্জী ছিল পাশের বাড়িতে, নইলে জানি না কোথায় গিয়ে উঠতুম তখন।'

আমরা সবাই রসের সন্ধান পেলুম। ঘোষের কাছে শুনেছিলুম, সান্যালের সেই ল্যাণ্ডলেডি ছিলেন খাপসুরৎ ভদ্রমহিলা। বয়স, তা বলা মুশকিল, দেখতে লাগে তিরিশ-বত্রিশ এবং সাজগোজের বাহার আহা-মরি গোছের। ছুরিতে ফুলকপি টুকরো করতে করতে বনানী জানতে চাইলে আসল ব্যাপারখানা কী?

'ছোট একটি কথা ভাই'—সান্যাল আর একটি সিগারেট ধরিয়ে বলে, 'সেদিন মেমসাহেব সেজেগুজে বেরোচ্ছেন, দোর-গোড়ায় আমার সঙ্গে দেখা। বললেন, 'সানিয়াল, কেমন লাগছে আমাকে?' আমি বললুম, 'চমৎকার, সঙ্গী হবার সাধ জাগছে।' 'আর আমার এই নেকলেসের লকেটটা?' মেমসাহেব তারিফের আশায় তাকিয়ে রইলেন।

চেয়ে দেখি, এরোপ্লেনের ডিজাইনে তৈরি ছোট একখানা লকেট, ধবধবে আধখোলা বুকের ওপর ঘাপটি মেরে লেপটে বসে আছে। ফস্ করে মুখ থেকে বেরিয়ে গেল—'বুঝলেন ফ্রাউ হাকের, এরোপ্লেনটা নয়, আমি রানওয়েটা দেখছি। বিউটিফুল।'

আর যায় কোথা, কটমট করে তাকিয়ে ভদ্রমহিলা গটমট বেরিয়ে গেলেন। পরদিন ভোরবেলা ছোট চিরকুট: 'অবিলম্বে ঘর খালি করতে হবে।'

বনানী খিচুড়ীর ডেকচি বিজলী উনুন থেকে নামিয়ে বলে, 'ঠিক হয়েছে, অমন যা তা মন্তব্য করতে যান কেন? ধরে চাঁটি যে লাগায়নি তাই ভাগ্যি অনেক।'

ফাইফরমাশ খেটে হয়রান মনোজ চৌধুরী তখন আরও পাঁচ প্যাকেট সিগারেট কিনে এনে ঘরে ঢুকেছে। আলোচ্য বিষয় 'ল্যাণ্ডলেডি' শুনে বললে, 'আমার অবস্থাই সবচেয়ে কাহিল।'

রায়চৌধুরী ফোড়ন কাটে, 'তা হবেই তো, যা ক্যাবলাকান্ত তুমি।'

ভালমানুষ মনোজ ওসব গায়ে মাখে না। বলে, 'আমার ল্যাণ্ড-লেডিটি হাড়-বজ্জাত, উঠতে বসতে জ্বালিয়ে মারছে। ইদানীং হয়েছে নতুন বিপদ। ওই বাহাত্তুরে বুড়ীর সঙ্গে হর শনিবার আমায় সিনেমায় যেতে হচ্ছে। কারখানার অল্পবয়সী মেয়েরা টিটকারি দেয়। কিন্তু কী আর করি। বিধবা বুড়ী এই ল্যাণ্ডলেডির মন জোগাতেই হবে। আছি অজ পাড়াগাঁয়ে, অন্য বাড়ি পাওয়াই মুশকিল।'

মনোজের দুর্দশার কথা শুনে আমাদের কোরাস হাসি। ছোট রান্নাঘর খিল্‌খিল্ করে উঠলো। গৃহকর্তা প্রবীর ঘোষ চটপট ছুটে জানালা বন্ধ করে দিলে। বললে, 'নীচে আমার ল্যাণ্ডলেডি ফ্রাউ মুলার আছেন, চেঁচামেচি শুনলে ছুটির দিনে এমন আড্ডা আর বসাতে পারবো না।'

হ্যাঁ, আড্ডার মত আড্ডা বটে। এবং কোথায়?—সুইজারল্যাণ্ডের

এক ছবির মত শহরে। জুরিখের কাছে আরাউ, তারই গায়ে লাগা ছোট শহর বুখস। তদধিক ছোট রাস্তা ফেরেনাভেগের এক বাংলো প্যাটার্নের চমৎকার বাড়ির দোতলায় রবিবারের সকাল জমজমাট হয়ে আছে। চারপাশ থেকে ঝেঁটিয়ে এসেছে প্রবাসী বাঙালী ইঞ্জিনীয়ারের দল। প্রায় রবিবারেই আসে।

তার কারণ ইঞ্জিনীয়ার প্রবীর এদেশে সস্ত্রীক। ঘোষ-দম্পতির বাড়িতে এলে বাঙালী রান্নার স্বাদ পাওয়া যায়। বাড়তি আকর্ষণ, ঘোষজায়া বনানীর খাসা গলা। রবীন্দ্র-সংগীতের সে একজন নাম-করা গাইয়ে।

আমিও গত কয়দিন ধরে ঘোষ-দম্পতির অতিথি। এদেশে ওদেশে ঘোড়দৌড়ের পর এখানে একটানা বিশ্রাম। দু'ভাঁজ করা ধুতিতে বানানো লুঙ্গি পরে এবং বেড-কভার গায়ে দিয়ে বাড়িতেই শুয়ে বসে দিন কাটাই। বনানীর হাতে তৈরি ভাত-ডাল, মাছের ঝোল খাই এবং অফিস থেকে প্রবীর এলে তিনজনে বিকেলে বেড়াতে বেরোই। দূরে পাহাড়, কাছে অথৈ জলের লেক। চেরী আর ফার গাছের ভিড়। কখনও আকাশ ফর্সা, ঘন নীল। কখনও ঝমর-ঝমর বৃষ্টি। আরাউ রেল-স্টেশন ছাড়িয়ে আমরা একদিন ছুটি ঐ দূরের পাহাড়ের কোলে, একদিন লেকের জলে নৌকো ভাসাতে। অষ্টপ্রহর দেশের কথা, কলকাতার কথা, ফাঁকে ফাঁকে বনানী হঠাৎ গান ধরে—'তাই শুনে আজি বিজন প্রবাসের হৃদয় মাঝে, শরৎ শিশিরে ভিজে ভৈরবী নীরবে বাজে।'

আবার কোনদিন দোতলা বাড়ির বারান্দায় বসে রোদ পোহাই। সামনে আঙুরলতার ঝাড়। দেয়াল বেয়ে বেয়ে ঘরের ভেতর উঁকি মারতে চাইছে। অলস ঔদাস্যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিই। রান্নাঘর থেকে কাচের বাসনের ও প্লেটের টুংটাং শব্দ আসে, আর আসে দু একটি গানের কলি :—'দিনান্তের এই এক কোণাতে,

সন্ধ্যামেঘের শেষ সোনাতে, মন যে আমার গুঞ্জরিছে কোথায় নিরুদ্দেশ।'

শনি রবি এলেই বাড়ির অন্য চেহারা। ল্যাণ্ডলেডি আর মেয়ে-বন্ধুর খপ্পর থেকে নিজেদের উদ্ধার করে কাছেপিঠে কাজ করা বাঙালী ছোকরাদের দল আসে। এবং সারাদিন সারারাত নরক গুলজার। আড্ডার কেন্দ্রস্থল এই রান্নাঘর।

সেদিন বনানী খিচুড়ির ডেকচি নামিয়ে ডিমের ওমলেট ভাজতে হাত দিয়েছে। জানালায় পিঠ দিয়ে এক মনে সিগারেট ফুঁকছে মিত্তির। বাডেনের সেনগুপ্ত টেবিলের ওপরে দু'হাঁটু মুড়ে। রায়চৌধুরী দুষ্টুমির হাসি হাসছে সর্বক্ষণ। সান্যাল একটি চেয়ার নিয়ে। মনোজ আছে বনানীর জোগালী হয়ে। ব্যস্তবাগীশ প্রবীর ছটফট ঘুরে বেড়াচ্ছে ঘরময়। এবং সেই আসরে শ্রীমান আমি খিচুড়ির প্রত্যাশায় জিবে শান নিয়ে চলেছি অনেকক্ষণ।

প্রবীর বললে, 'কার্তোপেল স্যালাড আর পাসতেৎলি বানালে কেমন হয়?'

আমি আপত্তি জানালুম। বললুম, 'আজ্ঞে না, নামের বাহার দেখে আর ভুলছি নে। জার্মানী ইংল্যাণ্ডে খাবারের মেনু দেখে অনেক ঠকেছি, আর নয়।'

'কেন কেন'—প্রবীর বলে, 'চমৎকার জিনিস পাসতেৎলি আর কার্তোপেল।'

'ঝাড়ু মারি পাসতেৎলির কপালে'—আমার চড়া গলা—'দেড় বছর এদেশে থেকে তুমি না হয় সুইস বনে গেছ, কিন্তু আমার সব জানা আছে। কার্তোপেল মানে তো আলু, তার সঙ্গে না হয় অন্ন-প্রাশনের ভাত উগরে আসার পক্ষে যথেষ্ট কোন জুসটুস হয়তো মেশাবে এবং ওই জিনিস পাতে দিয়ে খিচুড়ি-ওমলেট কপি ভাজার

মেজাজটা দেবে বিগড়ে। আমি ওতে নেই। তবে হ্যাঁ, ইলিশ মাছ ভাজা পেলে অবিশ্যি কথা ছিল না।'

ইলিশ মাছের নাম শুনে মনোজ প্রায় হাউহাউ করে কেঁদে ওঠে। কি ব্যাপার? মনোজ বলে, 'বাড়ির কথা মনে পড়ছে। গত বছর এমন সময় কী ইলিশ মাছই না খেয়েছি বাড়িতে। মা রান্নাও করেন তেমনি।'

বলা বাহুল্য, মনোজ 'বাঙাল', পূর্ববঙ্গের লোক।

ইতিমধ্যে বনানীর ঘোষণা: 'সবাই হাতে হাতে প্লেট নাও, খিচুড়ি রেডি।'

পলকের মধ্যে আমরাও রেডি। এবং বুফে খানায় প্লেটের পর প্লেট সাবাড়। সবাই গ্রোগ্রাসে গরম খিচুড়ি গিলছে। গোটা হপ্তা বিস্বাদ সুপ আর তদধিক বিস্বাদ কাঁচা এবং আধপোড়া মাংস খেয়ে খেয়ে থেঁৎলানো মুখ বদলানোর পক্ষে এমন উপযুক্ত টনিক আর কোথায় মিলবে!

সেনগুপ্ত বললে, 'আর নয়, এবার দেশে ফিরবো।'

মিত্তির বলে, 'আমিও। আচ্ছা বলুন তো, দেশে ফিরলে চাকরি-বাকরি পাব তো?'

আমি বললুম, 'সাধুর দাড়ি দেখে যেমন গল্পের সেই লোকটির আদরের রামছাগলের কথা মনে পড়েছিল, আপনাদেরও তেমনি খিচুড়ির স্বাদে দেশের কথা মনে পড়ছে। হলফ করে বলতে পারি কাল যখন আবার বান্ধবীদের সঙ্গে হাওয়া খেতে বেরোবেন দেশের কথা বেমালুম ভুলে যাবেন। প্রবীরের কথা অবিশ্যি আলদা, বনানীর কড়া নজর রয়েছে।'

সেনগুপ্ত— না না বিশ্বেস করুন, এ জায়গা আর ভাল লাগছে না। আমাদের কারও নয়। এই সুইসগুলো কথাবার্তায় চমৎকার, রোজগারও মন্দ করছিনে, কিন্তু কালা আদমি বলে সবাই আমাদের ঘেন্না করে। তার চেয়ে ঢের ভাল দেশে ফিরে ঘর সংসার পাতা।

রায়চৌধুরী— নেহরু গবর্নমেণ্ট আজকাল অনেক চালাক হয়ে গেছে, দেশে ফিরলেই হাজার টাকা মাইনের চাকরির ভেট আসবে না। আজকাল বিলেত-ফেরতদের কানাকড়ি দাম নেই।

আমি তৎক্ষণাৎ বলি, 'দাম হবেই বা কী করে? এমন একদিন ছিল যখন সারা তল্লাটে একটি কি দুটি বিলেত-ফেরত পাওয়া যেত। এখন বাংলা দেশের অবস্থা অন্য রকম। বিলেত-ফেরতের সংখ্যা এত বেশী, যে বিলেত যায়নি তারই কদর বেশী। তারাই সংখ্যালঘু কিনা। সংখ্যালঘুদের রক্ষাকবচ আগেও ছিল, এখনও আছে।'

মিত্তির— তাহলে বলছেন দেশে ফিরলে চাকরী পাব না?

'পাবেন না কেন'—আমি জবাব দিই, 'স্পেশাল কোন কোয়ালিফিকেশন না নিয়ে ফিরলে সাধারণ ইঞ্জিনীয়ার যা পায় তাই পাবেন। দেশে ইঞ্জিনীয়ারের অভাব তো রয়েছেই।'

বনানী এঁটো প্লেটগুলো বেসিনে জড় করতে করতে বলে, 'সান্যালের কোনদিন যাওয়া হবে না, গেলেও ফিরে আসবে।'

'কেন কেন'—সান্যালের জিজ্ঞাসা।

'আপনার সঙ্গে যাবার জন্যে যে অষ্টাদশী ফ্রলাইন তৈরী এবং ভারতকে শুধু তাজমহলের দেশ বলে যিনি ভাবছেন, তিনি যখন কলকাতায় নেমে খোলা নর্দমা আর খাটা পায়খানা দেখবেন, বাপ বাপ বলে নির্ঘাৎ ফের ইউরোপের জাহাজ ধরবেন।'

'নো নো, শী ইজ এ গুড গার্ল'—সান্যালের গলায় কৈফিয়তের সুর।

প্রবীর হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠে। বলে, 'মিত্তির, বাজেলের দাশগুপ্তের খবর শুনেছ?'

'তার আবার কী হয়েছে? সে তো গেল বছর দেশে ফিরেছে মেম বিয়ে করে।' মিত্তির জবাব দেয়।

'বিবি বাগ গিয়া'—প্রবীর রসিয়ে রসিয়ে শুরু করে, 'দাশগুপ্ত তো কলকাতা চলে গেল। তার মেম বউ নাটালির দু' মাস পর ফেরার কথা। দাশগুপ্ত কলকাতা থেকে ছুটে বোম্বে গেল বউকে জাহাজ থেকে তুলে আনতে। এদিকে সাজানো-গোছানো ফ্লাট কলকাতায় রেডি।

বোম্বেতে এক কেলেংকারি। বউ দাশগুপ্তকে দেখে বলে, 'নেহি যাউঙ্গী, দোসরা দোস্ত হো গ্যয়া।'—জাহাজেই এক অস্ট্রেলিয়ান ছোকরার সঙ্গে ভাব জমেছে, তাকেই বিয়ে করবে।

দাশগুপ্ত কী আর করে, ঘাড় চুলকে, দাঁত কামড়ে কলকাতায় ফিরে এল। বেচারা!'

'বেচারা!'—আমাদের সকলেরও একই সঙ্গে খেদোক্তি।

'সুতরাং সান্যাল'—প্রবীরের উপসংহার—'যাবে তো বান্ধবীকে সঙ্গে নিয়ে যেও। ফেলে গেলে পরে কিন্তু বুড়ো আঙুল চুষতে হতে পারে।'

মনোজ চৌধুরী এতক্ষণ চুপ করে ছিল। হঠাৎ বলে ওঠে, 'আমি বাবা বান্ধবী-টান্ধবীর মধ্যে নেই।'

ওর কথা শেষ হতে না হতেই বনানী হাসতে হাসতে বলে, 'কী দরকার, তোমার তো বুড়ী ল্যাণ্ডলেডিই রয়েছে।'

আড্ডা অনিবার্যরূপে বান্ধবী-কেন্দ্রিক হয়ে যাচ্ছে দেখে আমি বলি, 'আর নয়, এবারে অন্য কথা হোক। কিংবা চল, সবাই বাইরে কোথাও বেরিয়ে পড়ি।'

'না না, টিপির-টিপির বৃষ্টির মধ্যে কে বেরোয়'—রায়চৌধুরী বলে, 'তার চেয়ে গান কিংবা খোসগল্প হোক।'

গানের কথা উঠতেই বনানীর আপত্তি: 'ইমপসিব্‌ল্‌, গলা ধরে আছে। তার চেয়ে অমিতদা, তুমি একটা গল্প বল।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই বলুন'—সবাই ছেঁকে ধরল আমাকে।

পড়লুম বিপদে, কিন্তু ওরা নাছোড়বান্দা।

প্রবীর বললে, 'শিকারের গল্প জানেন? বাঘ কিংবা ভালুক শিকারের?'

'আমার চেহারা দেখে কি শিকারী-শিকারী মনে হয়?'—নিজের ক্ষীণতনুর দিকে আঙ্‌ল দেখিয়ে আমি শুধোলুম।

'যা হোক একটা কিছু বল'—বনানীর ফের আবেদন।

'আচ্ছা, তাহলে প্রবীর যখন বলেছে, শিকারের এক ছোট গল্প বলি। তবে আমার নয়, প্রিন্স অব ওয়েলসের।'

সবাই ততক্ষণে আর একদফা সিগারেট ধরিয়ে মৌজ করে বসেছে। আমিও শুরু করলুম:

ইংল্যাণ্ডের রাজকুমার এসেছেন ভারতবর্ষে। ভারতভ্রমণের অন্যতম অঙ্গ শিকার। মহামান্য বড়লাট বাহাদুরকে তিনি জানালেন, তেহরি গাড়োয়াল এলাকায় ভাল ভালুক পাওয়া যায় শুনেছি, সেখানে শিকারের ব্যবস্থা করুন।

'বন্দেগী জাঁহাপনা' বলে বড়লাট হুকুম দিলেন তেহরি গাড়োয়ালের এক নেটিভ রাজাকে: জলদি ভালুক-শিকারের ব্যবস্থা করুন, প্রিন্স অব ওয়েলস অমুক তারিখে আসছেন।

রাজাবাহাদুর পড়লেন অথৈ পাথারে। এই সীজনে ভালুক কাছে-পিঠে কোথাও পাওয়া যায় না। এই এলাকায় ভালুক আসে অন্য সময়। কী করা, কী করা—রাজাবাহাদুর ক্যাবিনেট মিটিং ডেকে বসলেন।

এদিকে দিনক্ষণ প্রস্তুত। বড়লাট আর প্রিন্স ওয়েলস্ কাড়া-নাকাড়া ব্যাণ্ডপার্টি বাজিয়ে অকুস্থলে হাজির। রাজাবাহাদুরও বিগলিত বিনয়ে মান্য অতিথিদের খিদমৎগারি করে চলেছেন।

রাত তখন একটা। গভীর জঙ্গল। হিস্ হিস্ শব্দ। মাচার ওপর বসে আছেন প্রিন্স অব ওয়েলস, বড়লাট এবং রাজাবাহাদুর। নীচে জ্বলছে মশালের আলো। ওদিকে পেছনে বিলিতি ব্যাণ্ড মহানন্দে নাচের বাজনা বাজিয়ে চলেছে তো চলেছেই।

হঠাৎ দূরে কিসের যেন ছায়া। হাঁ, হ্যাঁ, তাইতো! বিরাট একটা ভালুক! এগিয়ে আসছে, আসছে, আসছে। প্রিন্স অব ওয়েলস তাক্ কষলেন। ভালুক মাচার তলায় এসে পড়েছে। প্রিন্স ট্রিগার টিপতে যাবেন, এমন সময় এ কী কাণ্ড! ভালুক দু' পা তুলে বাজনার তালে তালে ধেই ধেই নাচতে শুরু করে দিয়েছে।

প্রিন্সের হাত থেকে রাইফেল পড়ে গেল। প্রিন্স তাকান বড়লাটের দিকে, বড়লাট রাজাবাহাদুরের দিকে।

ভয়ে কাঁচুমাচু রাজাবাহাদুর বলেন, 'আজ্ঞে হুজুর, এ সীজনে ভালুক জঙ্গলে থাকে না, অথচ আপনার হুকুম। শেষমেষ এক সার্কাস পার্টি থেকে অনেক টাকায় এই ভালুক ধরে আজ বিকেলে জঙ্গলে ছেড়ে দিয়েছিলুম। ব্যাণ্ডপার্টির পরিচিত বাজনা শুনে সার্কাসের এই ভালুকের সব তালগোল পাকিয়ে গেছে হুজুর।'

বড়লাট ঠোঁটে দাঁত চাপলেন। নেমকহারাম ভালুকটা তখনও ফক্সট্রটের ভঙ্গী মেরে আপনমনে নেচেই চলেছে।

আমি থামতেই একচোট হাসি। এবং প্রবীরের কণ্ঠে একটি মাত্র শব্দ :—গুল।

'তা গুল বলতে পার'—আমি জবাব দিই, 'কিন্তু এই নাচিয়ে ভালুকটার সঙ্গে তোমাদের এইসব বান্ধবাদের অনেকটা যেন মিল দেখতে পাচ্ছি।'

॥ ষোল ॥

ফ্রাংকফুর্ট হল গিয়ে লুফ্‌ৎহানসার 'বণ্ডিল টিশন'। আমাদের দেহাতী ভাইরা যখন বাংলাদেশ থেকে 'মুলুক' যায়—সে রাণাঘাট, রামপুরহাট বা আসানসোলেরই লোক হোক—ঘুরে-ফিরে প্রথমে আসে ব্যাণ্ডেল জংশন, তারপর রওনা দেয় নিজের নিজের বাড়ি। আরা, বালিয়া, মজঃফরপুর।

লুফ্‌ৎহানসার প্লেনে উঠলেও সেই ঝকমারি। ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে নিয়ে আসবে ফ্রাংকফুর্ট, সেখান থেকে যাও যেখানে খুশি—লণ্ডন, টোকিও, প্যারিস, নিউইয়র্ক।

জুরিখ থেকে যাব রোম, আমাকে আরও কয়েক শ মাইল ওপরের দিকে উজিয়ে যেতে হল তাদের ওই বণ্ডিল টিশনে। সেখানে এক রাত কাটিয়ে রোম।

ইতালিতে নেমে মনে হল বুঝি ভারতবর্ষেই এসে গেছি। লোকজনের হাবভাব ঢিলেঢালা। চেহারাছবিও তেমন ফ্যাটফ্যাটে ফর্সা নয়, পার্শী-পাঞ্জাবী বলে চালানো যায়। আর এদেশের 'সেনোরিতার' দল? কালো চুল আর টানা চোখে এক একটি পটাসিয়াম সায়োনাইডের শিশি। ছুঁয়েছ কি মরেছ!

কিন্তু হায়রে, তাদের অমন মিষ্টি ভাষাও যে ছাই আমার জানা নেই। একমাত্র পুঁজি 'নিয়ান্তে কাপিতো' (বুঝতে পারছিনে) বলে বলে কাঁহাতক আর চালানো যায়। এটিও তো মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে ভিয়া ফিরেনৎসের হোটেল রিচ্চি-র সেই ম্যানেজার কাম ওয়েট্রেস কাম মেড কাম রেসিপশনিস্টের কাছ থেকে শেখা। ভাষা জানা থাকলে আর কিছু-না হোক, ভেনিসে পূর্ণিমার রাত্রে

রিয়ালতো পুলের তলা দিয়ে গন্দোলায় যেতে যেতে 'মারিনা মারিনা' গান যখন শুনছিলুম, নির্ঘাৎ পাশের গন্দোলার মেয়েটির সঙ্গী হতুম।

তবে হ্যাঁ, ভাষা জানি আর না জানি, সেনোরিতাদের কোন প্রশ্নের জবাব দিতে পারি আর নাই পারি, রোমে এসে খরচ করছি বটে দু-হাতে। কথায় কথায় পাঁচশ, হাজার, দশ হাজার। অনেকটা পেনিসিলিনের লাখ, দশ লাখের মত। পোর্টারকে বখশিস দিচ্ছি তিনশ-চারশ, রেস্তোরাঁয় টিপস্ রেখে আসছি এক হাজার-দু হাজার। পঁচিশ-পঞ্চাশ হাত দিয়ে গলিয়ে পড়লেও কেয়ার করছিনে।

বলা ভাল, টাকায় নয়, হাতের সুখ মেটাচ্ছি 'লিরা'-র দৌলতে। না বললে হয়ত রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার এক্সচেঞ্জ কনট্রোল ডিপার্টমেণ্ট দমদম নামামাত্র আমার টুঁটি চেপে ধরবেন। লিরায় টাকায় আসমান-জমিন ফারাক।

প্যারিসের মত এখানেও সেই কনডাকটেড ট্যুর। তবে গাইডটি তেমন সুরসিক নয়। ভিকতোর ইমান্নুয়েল মনুমেণ্টের তলায় গাড়ি থামিয়ে বেটাচ্ছেলে বলে কিনা, 'দেখে আসুন, আমি এখানে অপেক্ষা করছি।'

সহযাত্রী মার্কিন ভদ্রলোক তো রেগে খাপ্পা। চটেমেটে বলেন, 'অপেক্ষা করছি মানে? এতগুলো পয়সা আপনার কোম্পানীকে দিলুম কী করতে?'

গাইড মুখ আমসি করে অগত্যা সঙ্গী হয়। ভাবখানা যেন আমাদের কৃতার্থ করেছে। ভাগ্যিস বিকালবেলা আর্ট-গ্যালারি আর মিউজিয়ামগুলো দেখার সময় আমাদের বরাতে এই কুঁড়ে গাইডটি আবার পড়েনি, অন্য একজন পড়েছিল।

এবং শেষোক্ত গাইডটির কৃপাতেই রোমের রাস্তাঘাট, বাড়িঘরের সঙ্গে আমার খানিকটা পরিচয় হয়। কোন্ রাস্তার কী ইতিহাস,

কোন্ বাড়িতে কে থাকতেন, শহরে এত ফোয়ারা কেন, এত স্কুটার কেন, এই ভগ্নস্তূপটি কোন্ সেঞ্চুরির—সালংকারে, সবিস্তারে সব সে বর্ণনা করেছে।

ন্যাশনাল আর্ট-গ্যালারিতে গিয়েও পাকা সমঝদারের মত প্রত্যেকটি মূর্তি প্রত্যেকটি পেন্টিং বুঝিয়ে বলেছে। এবং কথায় বার্তায় টের পেলুম সে আজকালকার অ্যাবস্ট্রেক্ট আর্টের ঘোরতর বিরোধী। মিকালেঞ্জেলোর ডিজাইনে তৈরী ক্যাপিটোলাইন মিউজিয়ামে সুন্দরী ভেনাসের মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে আমিও কবুল করে ফেললুম, অ্যাবস্ট্রেক্ট আর্ট আমারও মাথায় ঢোকে না।

গাইড হাসতে হাসতে বললে, 'না বোঝবার কী আছে? অ্যাবস্ট্রেক্ট আর্টের মত জিনিস আর নেই। দাঁড়ান, বুঝিয়ে বলছি। পাঁচ বাক্স চুরুট পুড়িয়ে এবং তিন রাত ভেবে ভেবে আর্টিস্ট একখানা সাদা কাগজে চারকোণা বর্ডার দিলেন এবং নীচে ক্যাপশন লিখলেন, 'একটি গরু ও দু-মুঠো ঘাস!' ব্যস, হয়ে গেল ছবি। দালালরা এল, হাজার পাউণ্ডে ছবিখানা বিক্রি পর্যন্ত হয়ে গেল। আপনি হয়ত জিজ্ঞেস করতে পারেন, ক্যাপশনের সঙ্গে ছবির মিলটা কোথায়! প্রশ্নটা স্রেফ আহাম্মকের। দু-মুঠো ঘাস? আরে, সেতো ওই গরুটা খেয়েই ফেলেছে—ছবিতে দেখা যাবে কেন? গরুটার কথা বলছেন? ফের কিন্তু আহাম্মুকী হয়ে গেল। ঘাস খাওয়ার পর গরু আর এখানে থাকবে কেন? সে-ও পালিয়েছে। সুতরাং ছবি ফাঁকা এবং বুঝলেন কিনা এরেই কয় অ্যাবস্ট্রেক্ট আর্ট।'

পরদিন শহর ছাড়িয়ে একটু দূরে। দু-পা এগোলেই সোনালী ধানে ঢাকা মাঠ। তদুপরি সূর্যের আলো আমাদের দেশের মতই

সদয়। মাঠের বুক চিরে হু-হু ট্রেন ছুটে চলেছে, নীল আকাশ ধোঁয়ায় কেমন কালো হয়ে গেল, আবার হেসে উঠল ফিক করে।

রোমে সেণ্ট পিটারের বাজিলিকা, কলিসিয়াম, ক্যাপিটল, রোমান ফোরাম, ত্রিনিতা দেই মোন্তি ইত্যাদি দেখতে দেখতেও মনে হচ্ছিল, হ্যাঁ, এতদিন পর এমন শহরে এলুম আমাদের যে-কোন প্রাচীন শহরের সঙ্গে যে পাল্লা দিতে পারে। আর সব তো অর্বাচীন—'এ-ডির কারবারী।' 'বি-সি' নিয়ে যদি লড়াই করতে চাও তো চলে এসো রোম, এথেন্সে। কায়রো, পিংকিং, বারানসীতে।

এবং এই 'চিরন্তন নগরী' সুন্দরী রোমার কোলে এসেই ইউরোপে প্রথম দিশেহারা হলুম আমি। অন্য দেশের কথা বাদ থাক, ভিনিস, ফ্লোরেন্সেও দেখে এসেছি, কিন্তু এখানে এত জিনিস থরে থরে সাজান, কারে ফেলে আর কারে রাখি! তাছাড়া দুঃসাহসেরও বলিহারি। যে শহর এক দিনে তৈরী হয়নি, তাকে কিনা এক গৌড়তনয় চব্বিশ ঘণ্টায় দেখে নিতে চায়!

জুলিয়াস সীজার যেখানে নিহত হয়েছিলেন, তারই পাশ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে, নীরো যেখানে বসে মানুষ জন্তুতে লড়াই দেখতেন সেইদিকে তাকিয়ে, বেন হার যেখানে রথের দৌড়ে ধুলো উড়িয়েছিল তারই কোণ ঘেঁষে খানিক দাঁড়িয়ে আমি পেছন ফিরে তাকিয়েছিলুম চোখ বুঁজে। দেখেছিলুম কয়েকটি চাষী আর মেষপালক পরিবারকে। কুইরিনাল পাহাড়ের এ-পার ও-পারে, টাইবার নদীর দক্ষিণ-পূর্বে, প্রায় তিন হাজার বছর আগে তিন-চারটে গ্রাম নিয়ে ওরা ঘর বেঁধেছিল, তারও অনেক পরে সঙ্ঘবদ্ধ হল এক শক্তিধর নেতার অধীনে। তার নাম রোমুলাস—যার নামে এই রোম।

তারপর কত উত্থানপতন, কত লড়াই, কত কীর্তিগাথা। ইতালি হল বিশ্বের সৌন্দর্যের রাজধানী। রোম হল ইতালির। শেক্সপীয়ারের নাটকে পড়া, বায়রন-ব্রাউনিংয়ের কবিতায় পড়া সেই ইতালি দেখতে

দেখতে হয়ে গেল দান্তে-পেত্রার্কা দাভিঞ্চি মিকেলাঞ্জেলোর দেশ। এমন দেশ না ঘুরে গেলে ইউরোপ আসাই যে বরবাদ।

এমন কি একবার দেখেও কুলোয় না, আশ মেটে না। মনোবাঞ্ছাপূর্ণকারী ত্রেভি ফাউণ্টেনে উলটমুখী পয়সা ছুঁড়ে চোখ-বোঁজা আমিও বিদায় নেবার আগে মনে মনে বলেছি : 'রোমা, আবার আসব।'

॥ সতের ॥

ভেবেছিলুম ফেরার পথে কায়রো থাকব দু' চার দিন। পিরামিড স্ফিংক্স তো দেখবই, মৌসৃকির বাজারে চক্কর মারব, সুলতান হাসান মসজিদে আজান শুনব এবং রাত বারটায় বেবিয়ে,—থাক আর বলে কাজ নেই।

শেষপর্যন্ত কিছুই হল না, রোম থেকে রওনা হবার খানিক আগে ঠিক করে ফেললুম, সোজা কলকাতাই চলে যাব। ঢের দেখা হয়েছে, আর নয়।

অন্য নগরে ঘুরে ঘুরে দেহ ক্লান্ত। চোখেরও বিশ্রাম নেই। লাগাম-পরা ঘোড়ার মত এ জায়গা ও জায়গা মাকু মেরে বেড়িয়েছি। যা দেখেছি তাও সব তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। বার্লিনের রাস্তা, লণ্ডনের দোকান, প্যারিসের হোটেল, রোমের গির্জে সব মিলে এক-জায়গায় মাখামাখি। সব দেশে সেই একই ছক-বাঁধা শহর। ঝকঝকে রাস্তা, উইণ্ডো-ডিসপ্লের কেরদানি, ফর্সা ফর্সা মুখ, অস্বস্তিকর পরিচ্ছন্নতা। না, আর নয়, এবারে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরবে।

কিন্তু সত্যি সত্যি কি আমি ইউরোপ দেখেছি? বোধ হয় দেখতে পারিনি। ঠাসা প্রোগ্রামে ভরা কনডাকটেড টুরে এ হোটেল থেকে ও হোটেল এবং অনেক দেখার ফাঁকে ফাঁকে গৎ-বাঁধা দু'চারটা কথা। ইউরোপের মানুষদের চোখে দেখেছি বটে, তাদের কাছে যেতে পারলুম কই? পথ চলতি যারা এসেছে, তাদের সুখদুঃখের কথা আরও আপন হয়ে শুনতে পারলুম কই? দূরের মানুষ যদি দূরেই থেকে গেল, তার দেশটাকে তাহলে চিনব কী করে?

হ্যাঁ, পূব বার্লিনের ওয়ার মেমোরিয়েলে সেই গাঁয়ের মেয়েটির কথা মনে পড়ছে, মনে পড়ছে প্যারিসের সেই গাইডের কথা, স্ট্র্যাটফোর্ড অন-এভনে অবিস্মরণীয় শেক্সপীয়ারি সন্ধ্যার কথা,

আল্পসের চূড়োয় বসে লিল্ডারহোফ কাসল-এ মার্কিন মেজরের জাপানী বউটির কথা। তাদের হাসিহাসি মুখ, রঙে রসে টইটম্বুর কয়েকটি টুকরো কথা এখনও মনে গেঁথে আছে। কিন্তু না, তার বেশী কিছু নয়।

আরও অনেক কথা মনে পড়ছে। ছোটখাট টুকরো টুকরো কথা। অনেকে জানতে চেয়েছে আমি রোমান ক্যাথলিক না প্রোটেস্টাণ্ট। কোনটিই নই জেনে ওরা আঁৎকে উঠেছে। তবে কী? —হিণ্ডু? সে আবার কী জিনিস?

অর্থাৎ ওরা অনেকেই ভাবতে পারে না খৃস্টান ছাড়া অন্য কোন ধর্ম আছে এই পৃথিবীতে। ইউরোপের অতি সাধারণ লোকের কথা বলছি।

হু'চারজন গুণীজ্ঞানী ওয়াকিবহালের কথা আলাদা, পশ্চিম ইউরোপের প্রায় সব জায়গাতেই ভারত আর ভারতীয় সম্পর্কে অজ্ঞতা অপরিসীম। এবং আরও আশ্চর্যের কথা, এখনও অনেকের ধারণা, সাপ-বাঘ-মহারাজা-জাহুকরের দেশ যদি কিছু থাকে, তবে আমাদের এই ভারতবর্ষ।

চাষী নয়, শ্রমিক নয়, জুরিখের কাছে আরাউ শহরে এক ইস্কুল-মাস্টারের সঙ্গে আলাপ করছিলুম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনাদের দেশে বিয়ে হয়?'

প্রশ্ন শুনে কার না রাগ ধরে। ভদ্রলোকটি আবার বললেন, 'ভারতীয় ভাষায় কোন স্ক্রিপ্ট্ আছে? নাকি রোমান অক্ষরেই কাজ চলে?'

দেখেছি, হু'চারজন লোক যাঁরা পড়াশুনো নিয়ে আছেন, ভারততত্ত্ব নিয়ে মাথা যাঁরা ঘামান তাঁরা, এবং মুষ্টিমেয় কয়েকজন রাজনীতিবিদ্ বাদ দিলে ঐসব দেশের ছাত্র, শিক্ষক, চাষী, দিনমজুর

—সাধারণ শ্রেণীর লোক শুধু ভারত কেন ভিনদেশ আর ভিনদেশী সম্পর্কে বিশেষ কোন জ্ঞান রাখে না। নিজের নাম লিখতে বা রগরগে কোন রহস্য-উপন্যাস পড়তে তারা পারে বটে, কিন্তু যদি একজন কলেজের ছাত্রকে জিজ্ঞেস করা হয় আফগানিস্থানের রাজধানী কি, সে আমতা আমতা করবে। এবং যদি কোন গাঁয়ের চাষীর কাছে জানতে চাওয়া হয় 'গান্ধী' নামে কোন লোকের কথা শুনেছে কিনা, সে প্রশ্নটি না শোনার ভাণ করবে।

তারি পাশাপাশি আমাদের দেশের চেহারা সম্পূর্ণ বিপরীত। বাংলা বা বিহারের চাষী নিজের নাম সই করতে পারে না ঠিকই, তাই বলে সে মোটেই 'অশিক্ষিত' নয়। রামায়ণ-মহাভারত সে জানে, নিজের কাজকর্ম সম্পর্কে অনেক ইংরেজী-জানা কৃষি-অর্থনীতিবীদের চেয়ে ওয়াকিবহাল। হিটলার চার্চিলের নাম সে শুনেছে এবং বাইরের লোকেরা সবাই যে "হিন্দু" নয়, একথাও বলতে পারবে।

আমাদের দেশের ছাত্রসমাজের সাধারণ জ্ঞানের পরিধিও বড়। পৃথিবীর প্রায় সব দেশের খুঁটিনাটি অনেক খবর তাঁদের নখদর্পণে। সাহিত্য-রাজনীতি-খেলা-সিনেমা সব বিষয়েই তারা নাক গলাতে পারে। আমাদের দেশের পনের-ষোল বছরের একটি ছেলে দেশ-বিদেশের যতখানি খবর রাখে, ইউরোপের ঐ বয়সের ছেলেরা ততটা রাখে না।

তাছাড়া অনেক আশা করে গিয়েছিলুম, জার্মানীতে হয়ত সুভাষচন্দ্রের নাম ঘরে ঘরে শুনব। নিরাশ হতে হল। কদাচিৎ দুচারজন বৃদ্ধ-বৃদ্ধা ছাড়া কেউ তাঁকে চেনে না। রবীন্দ্রনাথও তাই। প্রায় বিস্মৃত। হামবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের এক গ্রাজুয়েটকে অনেক কষ্টে বোঝালুম রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভার কথা। সে অন্ধকার হাতড়াতে হাতড়াতে শেষমেষ বলল—"মনে পড়ছে, মনে পড়েছে, গেল বছর

বন শহরে ভারতের কে একজন কবির বার্থ-ডে না কী যেন বেশ ঘটা করে হয়েছিল। তারই কথা বলছ নাকি?"

যুবকটি রবীন্দ্র-জন্মশতবার্ষিকী উৎসবের কথাই বলছিল।

রবীন্দ্রনাথের তুলনায় 'গান্ধী' বেশী চেনা। বেশ কিছু লোক জানে। তবে সর্বাধিক পরিচিত নাম 'নেহরু'। তিনি ভারতের রাজা, না প্রেসিডেন্ট, না প্রাইম-মিনিস্টার, তা ভাল করে নাই বা জানুক, শহর, গ্রাম সব জায়গায় সাধারণ লোক তাঁকে চেনে। কয়েকটি গ্রামে দেখেছি ভারতীয় বলাতে ফ্যালফ্যাল করে তাকাচ্ছে, 'নেহরু' বলতেই আমার গাঁইগোত্র মোটামুটি আন্দাজ করে নিয়েছে। এবং তাছাড়া 'ইণ্ডিয়ান' আর 'রেড-ইণ্ডিয়ানের' মধ্যে তফাত কোথায়, এখনও অনেককে বিস্তর কাঠখড় পুড়িয়ে বোঝাতে হয়।

লুফৎহানসার সেনেটের বিমান রোম ছেড়ে ভূমধ্যসাগরের নীল জলের ওপর যখন ছুটে চলেছে, এলোমেলো এইসব অনেক কথা ভাবছি। হাওয়াই হোস্টেস এটা-সেটা দিয়ে যাচ্ছে, খাচ্ছি, চোখ বুঁজেছি, খুলছি, তাকাচ্ছি জানলায় মুখ এগিয়ে। আর তর সইছে না, কখন পৌঁছব কলকাতায়?

কায়রোয় কিছুক্ষণের জন্যে বিশ্রাম। টুকিটাকি কিছু কেনাকাটা। হাবসি রেস্তোরাঁ-বয়-এর সঙ্গে খুচরো দুএকটা কথা, তারপর ফের দৌড়।

কলকাতায় যখন পৌঁছব, তখন তো ভোর। দমদমে কি তখন বৃষ্টির দাপট? কুঁড়ে-ঘর, সুপুরি আর নারকেলগাছের সারি, ডোবা, বনবাদাড় সব ডিঙিয়ে হঠাৎ নেমে পড়বে সেনেটর। ছুটে আসবে দমদমের কর্মীরা, চটপট লাগিয়ে দেবে সিঁড়ি, বাইরে

তাকিয়ে দেখব পূবে সূর্য উঠছে। আর দূরে? লোহার রেলিং ধরে কয়েকটি চেনা মুখ ওই তো দাঁড়িয়ে।

"শ্যাম্পেন, না অন্য কিছু?"

চমকে তাকালুম। দেখি হাওয়াই-হোস্টেস। পানীয়ের থালি হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে।—"না, কিছুই না, ধন্যবাদ"—আমি আবার চোখ বুঁজলুম

এপ্রিল মাসের সাতাশে দমদম ছেড়েছিলুম। মনে অনেক সংশয়, অজস্র কৌতূহল। শৈশব স্বপ্নের বিলেত দেশটা তখন সামনে দুহাত বাড়িয়ে। আর এখন? কৌতূহল অবসান, কাঁদিতেছে রাখালের গৃহগত প্রাণ।

কলকাতায় তো এখন গরম। যখন নামবো, এই গরম পোশাকের কী হবে? চৌরঙ্গী ঠিক তেমনি আছে তো? এখনও চিৎপুরের ষাঁড় ঘুরে বেড়ায়, দেয়ালে দেয়ালে ঘুঁটের আল্পনা পড়ে? নাকি এই ক মাসে কলকাতাটাই আমার কাছে অন্য নগর হয়ে গেছে?

কায়রো থেকে থাহ্‌রান। থাহ্‌রান থেকে করাচী। আগেকার সেই একই রুটে। ঘড়ির কাঁটায় আর স্থানীয় সময়ে ভাসুর-ভাদ্রবৌ সম্পর্ক। ঘণ্টায় ঘণ্টায় সব গরমিল হয়ে যাচ্ছে। আমার ঘড়িতে মাঝ-রাত, জানি না কলকাতায় ক'টা।

করাচীতে এক ইংরেজ উঠলেন। উঠে সামনে নিয়ে বসলেন মদের গেলাস। তারপর চুমুকের পর চুমুক। খানিক বাদে দেখি 'দুই চক্ষু জিনি নাটা ঘোরে যেন কুঁচ ভাটা।' অন্য দিকে মুখ ফেরালুম। বলা যায় না, সাহেবের বাচ্চা, কখন কী করে বসে। আমাকেই হয়ত দিলে দু চারটে গালাগাল লাগিয়ে।

হঠাৎ বিমানের মাইকে কলকল নিনাদ: দমদমের দেরি নেই, কলকাতার যাত্রীদের বিদায় সম্ভাষণ জানাই। আবার দেখা হবে। আউফ ভিডারজেহন।

মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই দমদমের মাটি। সেই পরিচিত গাছপালা, পরিচিত ঘরবাড়ি। চুঙ্গিঘরের হুজ্জত কাটিয়ে উঠলুম শহর-গামী বাসে।

যশোহর রোডে পড়তেই খোলা ডাস্টবিনের বদগন্ধ, লোকজনের ভিড়, আবর্জনার স্তূপ। শ্যামবাজার পাঁচমাথার মোড়, ভূপেন বোস এভিনিউ, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ পেরিয়ে বাস গ্র্যাণ্ড হোটেলের তলায় থামল। বাসের গা ঘেঁষে দাঁড়াল একখানা ট্যাক্সি। ভোরবেলা তাহলে কলকাতার ট্যাক্সি সাত রাজার ধন এক মাণিক নয়!

ট্যাক্সি ময়দানে পড়ল। চারপাশে গঙ্গার ধুধু হাওয়া। শরীরটা আপনা থেকেই জুড়িয়ে গেল। আঃ!

মারকিন মুলুক

॥ এক ॥

মাঝখানে বাদ কয়েক ঘণ্টা, তারই মধ্যে একেবারে পৃথিবীর ওপিঠে। দিল্লি তেহেরাণ বেইরুট ইসতামবুল বেলগ্রেড ফ্রাংকফুর্ট, লনডন—একসার নাম। নামে নামে যতি। তারপরেই ছ ঘণ্টার ছুট লাগিয়ে আটলানটিক পার, জে. এফ. কেনেডি এয়ারপোর্টে ইতি। না, ইতিই বা বলি কী করে, প্লেন পালটে নিউইয়র্ক ছেড়ে সোজা ওয়াশিংটন ডি-সি। সেখানে পাঁচ দিনের সম।

পৃথিবীর ওপিঠে না হয় পৌঁছলুম, কিন্তু এ আবার কী ফ্যাসাদ! রাতে ঘুম আসে না, দিনে চোখ জড়িয়ে আসে। খোদ মারকিন স্টেট ডিপার্টমেন্টের অতিথি, কিন্তু এই উলট পুরানের ঠেলায় প্রথম দিনের সব এনগেজমেন্ট বরবাদ, সকাল থেকে দুপুর থেকে সন্ধ্যা কেটে গেল উইণ্ডসর পার্ক হোটেলের বিছানায়। হাজার হাজার কিলোমিটার, সাত সমুদ্র একশ তের নদী পাড়ি দেওয়ার ক্লান্তিতে নয়, কলকাতা ওয়াশিংটনে দিনে রাতের উলটোপালটাতেই যত গণ্ডগোল।

এই গণ্ডগোল সামলাতে গেল পাক্কা দু দিন দু রাত। তারপরই শুরু হল প্রোগ্রাম নামধারী ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে প্রায় পাঁচ মাসের মারকিন মুলুক সফর। সফর বলা ভুল, বাগাটেলি খেলার বলের মত অন্য নগরে নগরে কেবল ছুট। এক হোটেল থেকে অন্য হোটেল। মাঝখানে সকাল থেকে রাত আড়াইটা ঠাসা প্রোগ্রাম। এটা দেখা, সেটা দেখা, পার্টিতে খাওয়া, কনফারেন্সে যাওয়া, দম ফেলার ফুরসৎ নেই। তারই মধ্যে হাউ নাইস, একসেলেন্ট, স্প্লেনডিড ইত্যাদি নিরর্থক কতকগুলো শব্দ উচ্চারণ করে শত শত অপরিচিতের সঙ্গে অন্তরঙ্গ হওয়ার চেষ্টা।

আমরা দলে আছি জনা কুড়ি, সতেরটি দেশের প্রতিনিধি, সবাই

সাংবাদিক। ভারত থেকে আমরা তিনজন। আনন্দবাজারের আমি, দিল্লি-স্টেটসম্যানের এম এল কোতরু আর মাদ্রার তামিলনাড়ু কাগজের সম্পাদক এলুমালাই। আমরা সবাই এসেছি স্টাডি কাম ওয়ার্ক কাম ট্রাভেল প্রজেক্টে। ব্লুমিংটনের ইনডিয়ানা ইউনিভারসিটিতে বসছে সাংবাদিকতার সেমিনার, সেখানে কাজ সেরে পূর্ব উপকূলের এক একটি দৈনিক কাগজে আলাদা আলাদা কাজ কিছু দিন, তারপর পশ্চিম উপকূলে আবার আলাদা আলাদা কাগজে আলাদা কাজ এবং তারই আগে পিছে নিজের পছন্দ মত মারকিন মুলুকের নগর দর্শন করা।

সফর সূচীর শুরু ওয়াশিংটনে। সেখানে ওই উইণ্ডসর পার্ক হোটেলেই দলের অন্যান্যদের সঙ্গে পরিচয়। পোল্যাণ্ড যুগোশ্লাভিয়া চিলি ব্রাজিল তাইল্যাণ্ড লাওস জাপান জামাইকা ট্রিনিডাড ফরমোজা হংকং কোরিয়া ভিয়েতনাম নেপাল ভারত হরেক রকম দেশের হরেক রকম প্রতিনিধি। কাজ চলা ইংরেজী মোটামুটি সবাই জানেন। বয়সেও বিশেষ ফারাক নেই—ব্যতিক্রম দুজন, দুজনেই মহিলা। একজন চিলির বিখ্যাত লা নাসিও কাগজের রিপোরটার মিসিস মারিনো, বয়স পঞ্চাশোর্ধ্বে, আর সর্বকনিষ্ঠা জামাইকার নিগ্রোতরুণী মিস ইংলিশ, বাইশ তেইশের বেশী নয়।

হোটেলের লাউনজে সবচেয়ে আগে এগিয়ে এসে আলাপ করল ড্রাগোশ্লাভ রানচিক, বেলগ্রেডের 'বোরবা'-র রাজনৈতিক সংবাদদাতা। এসেই জড়িয়ে ধরল, বলল, ইনডিয়ান? ইয়েস, উই আর ফ্রেণ্ডস।

রানচিক এসে পৌঁছেছে সবার আগে। সে-ই আলাপ করিয়ে দিল অন্য সবার সঙ্গে।—মারিয়ান তুরস্কি—ওয়ারশ থেকে এসেছে, ইয়েশি আমানো, ওশাকার, আর এই যে অ্যানাদার ইণ্ডিয়ান ফ্রেণ্ড ফ্রম ডেলহি—মিসটার কোতরু। কোতরু কিংবা এলুমালাই

কারও সঙ্গে আমার আগে আলাপ ছিল না, এখানেই শুরু। কোতরুকে দেখে ভেবেছিলাম লাতিন আমেরিকার লোক, কটা চোখ, ধবধবে ফর্সা রঙ, দশাসই চেহারা। আর এলুমালাই? চেহারায় তো বটেই, এক লাইন ইংরেজী উচ্চারণেই টের পাওয়া যায় নির্ঘাৎ দক্ষিণ ভারতীয়।

আমাদের দলের নেতা প্রফেসর ফ্লয়েড আরপান। ইনডিয়ান ইউনিভারসিটিতে জারনালিজম পড়ান এবং প্রতি বছরই এই প্রজেকটের ডিরেক্টর। আমাদের অফিসের সহকর্মী হিন্দুস্তান স্ট্যানডার্ডের সাময়িকী সম্পাদক শ্রীভবেশচন্দ্র নাগ আমার হাত দিয়ে আরপানের হাতে একটা পরিচয়-লিপি পাঠিয়েছিলেন, সেইটে তাঁর হাতে তুলে দিলাম। ভবেশবাবু ১৯৬০ সালে এই প্রজেকটেই এদেশে এসেছিলেন। আমি এলাম চার বছর পরে। তখন সেপ্টেম্বর মাস।

আরপান সবার হাতে তুলে দিলেন একগাদা কাগজ। তাতে দলের সকলের পরিচয়পত্র, অন্যটিতে গোটা প্রোগ্রাম সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ, আমেরিকা সম্পর্কে নানা তথ্য এবং ওয়াশিংটন শহরে আমাদের পাঁচদিনের সফরসূচী।

ওয়াশিংটনের স্টেট ডিপার্টমেন্টে প্রোগ্রাম কষে নিয়ে শুরু হল আমাদের যাত্রা। গোড়ায় হোয়াইট হাউস, সেনেট, আরলিংটন সেনেটারি, ওয়াশিংটনের জন্মস্থান, লিংকন মেমোরিয়েল ইত্যাদি স্থানীয় দ্রষ্টব্যগুলো সেরে নিয়ে এক ফাঁকে দল বেঁধে ঘুরে এলাম নিউইয়র্কের বিশ্বমেলা। সেখান থেকে ফিরে সোজা ইনডিয়ানার ব্লুমিংটন ইউনিভারসিটি। ওখানেই সেমিনার। এক মাস ওখানে থাকতে থাকতেই শিকাগো, লুইভিল ইত্যাদি লাগোয়া সব জায়গাও সেরে নেওয়া হল। তারপর আবার নিউইয়র্ক। সেখান থেকে পূর্ব উপকূলের এক একটি কাগজে জুড়ে দেওয়া হল এক এক

জনকে। আমার জন্যে বরাদ্দ হল নিউ জারসির নিউ ব্রানসউইক শহরের 'দি হোম নিউজ' কাগজ। ট্রেনেই চলে গেলাম।

নিউ ব্রানসউইকে তিন হপ্তা কাটানোর সময় দুদিনের জন্যে ঘুরে এলাম ফিলাডেলফিয়া। তারপর বিমানে চক্করের পর চক্কর। প্রথমে বসটন, বসটন থেকে বাফেলো—নায়েগ্রা দেখতে। সেখান থেকে ডেটরোয়েট, কলমবাস, ডেনভার, সানফ্রানসিসকো হয়ে লস এনজেলসের সানটা মনিকায় আবার তিন হপ্তার জন্যে স্থিতি। আবার কাজ 'দি আউটলুক' কাগজে। লস এনজেলস থেকে গ্র্যাণ্ড ক্যানিয়ন, আলবুকার্কি, সান্তা ফে, ডালাস, নিউ অরলিয়েন্স হয়ে আবার ব্লুমিংটন। ব্লুমিংটন থেকে ফের নিউইয়র্ক, লনডন, বোম্বাই হয়ে দমদম। ঝটিকা-সফরের শেষ।

অসংখ্য জায়গা, অসংখ্য লোকের সঙ্গে নতুন পরিচয়। সব মিলিয়ে মনের পর্দায় সব সময়ই ভাসে কতকগুলো ছবি। তার মধ্যে প্রধান নির্বাচনের ব্যাপার। আমি যখন ওয়াশিংটনে গিয়ে প্রথম পৌঁছই, তখন জবর লড়াই শুরু হয়ে গিয়েছে জনসনে গোল্ডওয়াটারে।

সাম্প্রদায়িক প্রাদেশিক ইত্যাদি কয়েকটি গালভরা গালাগাল আমাদের উপর অনবরত পড়ে। বিদেশীরা যত বলে, আমরা ভারতীয়রা তার চেয়ে বেশি বলি। কিন্তু যাচাই করলে দেখা যায়, অপরাধী কেবল আমরা নই, অতি অগ্রসর অতি উন্নত দেশগুলিও এই ব্যাপারে সাচ্চা নয়, বরং কোন কোন ক্ষেত্রে আমাদের চেয়ে বেশি সাম্প্রদায়িক, বেশি প্রাদেশিক।

বিদেশী এই সাম্প্রদায়িকতার পরিচয় পাই প্রবাসকালে। দেখতে পাই "হিন্দু-মুসলমান, ব্রাহ্মণ-সদগোপ, ঘটি বাঙাল, মেয়ে-

পুরুষ, পূর্ব-পশ্চিম" ইত্যাদি বাছবিচার সেখানে আমাদের দেশের মতই এবং ঠিক এদেশে যেমন ইলেকশনের সময় সব বিভেদ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে, ওদেশেও তেমনই এরূপ অনেক বিভেদের তলায় নির্বাচনী প্রচারের আসল প্রশ্ন তলিয়ে যায়। মারকিন প্রেসিডেণ্ট নির্বাচনে ১৯৬৪ সালের জনসন-গোল্ডওয়াটার লড়াই আমি সচক্ষে দেখেছি এবং তার সঙ্গে দেখেছি এই ভোটাভুটির পালায় সাম্প্রদায়িকতার স্থান কতখানি।

গোল্ডওয়াটারকে ভোট দিতেই হবে। কেন? আ-রে ও যে আমার আরিজোনার লোক। জনসনকে ভোট দিতেই হবে? কেন? আ রে ও যে আমার মত ক্যাথলিক নয়।

এই কথোপকথন কাল্পনিক নয়, এই ধরণের অসংখ্য মন্তব্য আমি নানা জায়গায় শুনেছি।

নভেম্বরের তেসরা নির্বাচন। সেপ্টেম্বরের গোড়ার দিকে পৌঁছে দেখি গোটা মারকিন মুলুক শ্লোগানে আর বিজ্ঞাপনে জমজমাট। এবং সব কিছুরই বক্তব্য হয় জনসনকে ভোট দিন, নয় গোল্ডওয়াটারকে ভোট দিন। আমাদের দেশের মত দেয়ালে দেয়ালে পোস্টার মারা নেই, ওদেশে লড়াই টেলিভিশনে আর খবরের কাগজে। টেলিভিশন, আর খবরের কাগজও দ্বিধাবিভক্ত। সম্পাদকীয়তে সোজাসুজি একজনকে সমর্থন জানানো হয়। আবার টাকা ঢাললে ডেমোক্রেটিক কাগজ রিপাব্লিকান প্রার্থীর ভোট প্রার্থনায় বিজ্ঞাপন ঘটা করে ছাপায়।

আমাদের দেশের মত নির্বাচনী মিছিলও তেমন নেই। নিউ-ইয়র্ক বা শিকাগো শহরে সন্ধেবেলা দুচারটে ছেলে ছোকরার পথসভা দেখেছি বটে, কিন্তু তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। ওদের সভা হয়, কিন্তু তার রীতিনীতি ধরণ ধারণ আলাদা। ইণ্ডিয়ানাপোলিসে জনসনের এক সভায় আমি হাজির ছিলাম। জমায়েত হাজার দুই লোক।

মাথায় জনসন-টুপি, তাতে লেখা LBJ FOR THE USA. (এটাই ছিল এবারের ডেমোক্রেটিক পার্টির শ্লোগান। আগেরবার কেনেডির ছিল LETS BACK JACK, তার আগে আইসেন আওয়ারের ছিল I LIKE IKE. এই শ্লোগান নির্বাচনের উপর নাকি ওদেশে জয় পরাজয় অনেকখানি নির্ভর করে) চিৎকার চেঁচামেচি ব্যাণ্ড পার্টির বাজনা, মেয়েদের নাচ। জনসন এসে অল্প দু কথা বললেন পাঁচ মিনিট, সমর্থকদের সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করলেন ত্রিশ মিনিট। ব্যস, সভা খতম। শুনলাম সাকসেসফুল ইলেকশন মিটিং।

রিপাবলিকান প্রার্থী গোল্ডওয়াটারের সঙ্গেও ছিলাম একদিন। একটা বিশেষ নির্বাচনী ট্রেনে চড়ে কয়েক শ মাইল ঘুরলেন। স্টেশনে স্টেশনে ট্রেন থামল, আর সেকরেটারির তৈরি করে দেওয়া বক্তৃতার নকল গড়গড় তিনি পড়ে গেলেন। জনতা হাততালি দিল, হ্যাণ্ডশেক করল। ব্যস, নির্বাচনী সফর এখানেও শেষ। এখানেও সাকসেসফুল।

তা ছাড়া প্রচারের আরও দুটি পন্থা। লাঞ্চ ডিনারে বক্তৃতা এবং টেলিভিশনে দ্বৈতবিতর্ক। অনেকে বলেন ১৯৬০ সালে রিপাবলিকান প্রার্থী নিকসনের হারার মূলে ওই টেলিভিশন-ডিবেট। নিকসনের জোর নামডাক, কেনেডি প্রায় অপরিচিত। নিকসন প্রচার চালাচ্ছেন নিজেকে সুবক্তা বলে। "আমি ক্রুশ্চভের সঙ্গে তর্কযুদ্ধ করেছি, স্কুলে ডিবেট কম্পিটিশনে ফার্স্ট হয়েছি, অতএব আমাকে ভোট দাও" ইত্যাদি। কেনেডি সুযোগ বুঝে ওঁকে ডাক দিলেন টেলিভিশন ডিবেটে। নিকসন রাজি হলেন এবং সেটাই হল তাঁর কাল। রাজি হওয়া মাত্র কেনেডি হয়ে গেলেন নিকসনের সমান সমান। ক্রুশ্চভের সঙ্গে যে পাল্লা দেয়, সেই নিকসন যখন কেনেডির পাশাপাশি বসলেন টেলিভিশনের আসরে, ভোটদাতারা তখনই ধরে নিল যোগ্যতায় দুজন সমান সমান। কেনেডির কথাবার্তার ধরণ হল চতুর, ভাবভঙ্গী হল

চমৎকার এবং বিরাট একদল ভোটদাতা অন্যদিকে চলে পড়ল তার পরেই। ব্যস, অল্প কয়েকটি ভোটে অতঃপর নিকসনের হার। ১৯৬৪ সালেও গোল্ডওয়াটার জনসনকে টেলিভিশন ডিবেটে আহ্বান করেছিলেন। জনসন বুদ্ধিমানের মত রাজি হন নি।

অবশ্য এসব প্রচার বাহ্যিক, আসল প্রচার তলে তলে। এবং সেই প্রচারের খবর নিলে সাম্প্রদায়িকতা আর প্রাদেশিকতা ধরা পড়ে। প্রথম কথা, আমাদের দেশে হিন্দুমুসলমান বিভেদের মত ওদেশে সাদা কালোর তফাত। সুবুদ্ধিসম্পন্ন লোক সবদেশেই রয়েছেন; তবে আমাদের দেশে যেমন, সবদেশেই তেমনই এঁরা সংখ্যালঘু। বাকি সবাই ভোট দেবার বেলায় বাহ্যিক বিভেদটাকে বড় করে দেখেন। তাই ভোটের লড়াইয়ে মার্কিন দেশে নিগ্রো-অনিগ্রো দ্বন্দ্বটা বেশ বড় হয়ে ফুটে ওঠে। সাদা রঙের প্রার্থী ছলেবলে কৌশলে নিগ্রো ভোট বাতিল করতে সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। দক্ষিণের একটি রাজ্যে অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও শতকরা পঁচিশ ভাগ নিগ্রোর ভোট নেই। ওই রাজ্যের সাদা গবর্ণরকে এই ব্যাপারে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, "ঠিকই হয়েছে, নইলে কালোরা নির্বাচনে জিতে যাবে যে।"

কেনেডি যখন নির্বাচনে দাঁড়ান তাঁর বিরুদ্ধে নন-ক্যাথলিকরা অনেকেই জড় হয়েছিলেন। রিপাবলিকান না ডেমক্রেট সেই বিচার নয়, ক্যাথলিক না ক্যাথলিক নন, সেই প্রশ্নটাই বড় হয়ে দাঁড়ায়। আবার ভিন্ন দলভুক্ত হয়েও আইরিশ বংশোদ্ভূত ভোটাররা দলে দলে তাঁদের "স্বজাতি" কেনেডিকে ভোট দিয়েছিলেন।

ঠিক তেমনই এবার গোল্ডওয়াটার একটা শ্লোগান তুলেছিলেন, "আমি পশ্চিমী, পশ্চিমের লোকেরা সবাই আমাকে ভোট দাও।" গোল্ডওয়াটার হেরেছেন বটে, কিন্তু সেই ডাকে বেশ কাজ হয়েছিল। পশ্চিম অংশ থেকে কেউ প্রেসিডেণ্ট হয় না, বেশির ভাগই পূর্ব

বা মধ্যাঞ্চলের—এই ক্ষোভ কালিফরনিয়া আরিজোনা ইত্যাদি পশ্চিমী রাজ্যের অনেক ভোটারের। জনসন যখন জিতলেন, লস এনজেলসের এক মান্যগণ্য রিপাবলিকান আমাকে বলেন, গোল্ডওয়াটার জিতলে ভাল হত বটে, তবে একমাত্র সান্ত্বনা জনসন মিসিসিপি নদীর ওপারের লোক নন। অর্থাৎ পূর্বী নন।

দুই প্রান্তের রেষারেষি আমাদের দক্ষিণ উত্তর বা কলকাতা বোমবাই রেষারেষিকেও ছাড়িয়ে যায়। ওদেশের উত্তরে দক্ষিণে বিভেদের কথা তো ইতিহাসেরই ব্যাপার, উপরন্তু ইদানীং পূর্ব উপকূল ও পশ্চিম উপকূলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা বেড়েই চলেছে। কোন লস এনজেলসবাসীকে যদি বলা হয় বসটন শহরটা বেশ, অমনি তিনি চটেমটে বলবেন—'কোন্ জায়গার কথা বললেন? বসটন? ও? দ্যাট ওল্ড অ্যাণ্ড কোল্ড ডারটি সিটি?' আবার নিউইয়র্কের কোন নাগরিককে যদি বলা হয়, সানফ্রানসিসকোর মত শহর হয় না। নাগরিক মহোদয় তৎক্ষণাৎ উত্তর দেবেন, আপসটার্ট। বসটন বা নিউইয়র্ক কোন কিছু ভাল করলে লস এনজেলস-সানফ্রানসিসকোর গায়ে বাজে।

ভারতের মত মারকিন যুক্তরাষ্ট্রও বহু ভাবধারায় শতধা। এবং ঠিক ভারতের মত সেখানেও অনৈক্যের ভিতর ঐক্য। সেই কারণেই মার্কিন দেশের নাগরিক হয়েও সেখানে এখনও অনেকে তাদের আদি দেশ বা আদি বংশ পরিচয় ভুলতে পারে নি। রাস্তা দিয়ে হাঁটলে আপনি মার্কিনী দেখতে পাবেন না। কেউ ব্রিটিশ, কেউ জার্মান, কেউ ইতালীয়, কেউ ইহুদী। কোন পার্টিতে বা ঘরোয়া বৈঠকে নতুন পরিচয়ের শুরুতে একটি অনিবার্য প্রশ্ন—হোয়াটস্ ইওর অরিজিন?

আর ইউ—?

উত্তরদাতা সোল্লাসে গড়গড় বলে যান—আমি হচ্ছি অমুক, আমার ঠাকুরদা ছিলেন জার্মানির বনেদী পরিবার ইত্যাদি।

ফিলাডেলফিয়ার এক মার্কিন পরিবারে দেখেছি বাড়িতে তাঁরা গ্রীক ভাষায় কথা বলেন এবং গ্রীক মাস্টার রেখে ছেলে-মেয়েদের নিয়মিত পূর্বপুরুষের ভাষা শিক্ষা দেন। গ্রীকে—গ্রীকে, জার্মানে—জার্মানে, আইরিশে—আইরিশে মনের মিল। সেখানে রাজনীতি গৌণ। ভোটের সময় তার প্রতিফলনও হয়।

আবার ধর্মের ব্যাপারেও ইহুদী খৃস্টানে দ্বন্দ্ব কম নয়। ডালাসের এক মহিলা আমাকে বলেন, তাঁর ছেলেকে ইহুদী বলে স্কুলে মনমরা হয়ে থাকতে হয়। অনেক জায়গায় ভরতি পর্যন্ত করা যায় না। ওদিকে নিউইয়র্ক শহরে ইহুদীদের দাপট প্রচুর। গোটা ইজরাইল রাষ্ট্রে যত ইহুদী, তার চেয়ে অনেক বেশি ঐ শহরে। তাই সেখানে সেনেটর পদ নিয়ে কীটিং আর বব্ কেনিডির মধ্যে যখন লড়াই চলছে, দুপক্ষই ইহুদীদের তোয়াজ করার জন্য উঠে পড়ে লেগে যান। দুই দলের নীতিগত আদর্শ প্রচার নয়, কে কত বেশি ইহুদী দরদী, সেটা প্রচার করাই মুখ্য হয়ে দাঁড়ায়, এবং বলা বাহুল্য, তাতে কাজ হয়।

আর নিগ্রো ও শ্বেতকায়দের মধ্যে যে বৈষম্য সে তো জানা কথা।

শুধু সাদা কালোর দ্বন্দ্ব নয়, আরও অসংখ্য বিভেদ মারকিন যুক্তরাষ্ট্রের মত অন্যান্য সর্বাধুনিক দেশেও স্পষ্ট। ইউরোপের অন্যান্য দেশেও রয়েছে। ধর্মে, জাতিতে, বর্ণে, সম্প্রদায়ে, প্রান্তে—সর্বত্র। অবশ্য তার মানে এই নয় যে, মারকিন দেশে আছে বলেই ভারতে এসব জিনিস সমর্থনযোগ্য। প্রাদেশিকতা বা সাম্প্রদায়িকতা—যে কোন রকমের সংকীর্ণ বুদ্ধিই বিষবৎ পরিত্যাজ্য। নিউইয়র্ক শহরে একটি ভিক্ষুকের দেখা মিলেছে বলে কলকাতা শহরের ভিক্ষা-বৃত্তির ওকালতি করার মধ্যে আর যাই থাকুক, যুক্তি নেই। শুধু এইটুকুই বলতে চাই, ভারতের মত মারকিন দেশও মাটির।

॥ দুই ॥

লস এনজেলসে এলেই মনে পড়ে হলিউডের কথা। আমি হলিউডের পাড়াতেই ছিলাম—সানটা মনিকায়। বেভারলি হিলসে টোয়েনটিয়েথ সেনচুরি ফক্সের স্টুডিওতেও গিয়েছি, কিন্তু ওখানে আমার সবচেয়ে ভাল লেগেছে যে-দুটি জিনিস, তারই কথা শুধু বলব।

ডেলাইট ট্রেনে একেবারে প্রশান্ত মহাসাগরের কোল ঘেঁষে সানফ্রানসিসকো থেকে লস এনজেলস স্টেশনে নামার পরই আমাকে পাকড়াও করল রন ফাংক—'দি আউটলুক' কাগজের ম্যানেজিং এডিটার, আমি যাঁদের অতিথি। রন আমাকে নিয়ে গেল সার্ফ রাইডার্স ইন হোটেলে। সামনে ওশেন এভিনিউ, পিছনে প্রশান্ত মহাসাগরের গর্জন। গোটা হোটেলময় আনন্দ-উৎসব। কেন না, বড়দিন আসছে।

ঠিক করলাম, বড়দিনের সময় হোটেলে নয়, কোন মারকিন বাড়িতে কাটাব। রনই বের করল তার এক পরিচিতকে। তিনিই আমাকে সানন্দে স্থান দিলেন তাঁদের পরিবারে দিন দশেকের জন্যে।

এমনিতেই মারকিন মুলুকে ক্রীসমাস নিয়ে যা হুল্লোড়বাজি চলে, তার ছিটেফোঁটা খবর এদেশেও খানিক আসে। আর মারকিন দেশের চেয়েও কড়া মারকিনী হলিউড মুলুকে তার রকমটা কেমন হতে পারে আন্দাজেরও বাইরে। দাপাদাপি করতে গিয়ে ক্রীসমাস ইভের সময় সারা দেশে যে হাজার পাঁচ ছয় মোটর দুর্ঘটনায় মৃত্যু ঘটে, তার আদ্ধেকই হয় ওই কালিফরনিয়ায়। তাছাড়া কত কোটি পিপে মদ মানুষের পেটে যায়, তার হিসেব রাখা আই-বি-এম্ মেশিনেরও অসাধ্যি।

বড়দিন আসছে, তার খবর আগেভাগেই জানা যায়, ক্রীসমাস

কার্ডের পাহাড় দেখে। ডিসেম্বরের শুরু থেকেই কার্ড-বিনিময় শুরু। এই কার্ড ছাপানো, বিক্রি করা এক বিরাট ইনডাষ্ট্রি। সারা দেশে লোকসংখ্যা কুড়ি কোটি, কিন্তু কার্ড ছাপা হয় প্রতি বছর কমসে কম দু'শ কোটি। কার্ডের নানান রকম, নানান বাহার, এবং তার টাল্ল সামলাতে না পেরে ভিরমি খেয়ে পড়ে ডাক-বিভাগ। তাই সে সময় মাস দুয়েকের জন্যে ডাকবিভাগে বাড়তি লোক নেওয়া হয় লাখ-খানেক ছাত্ররা দু' পয়সা কামায় এবং পথেঘাটে দোকানপাটে হাজার হাজার নোটিস পড়ে. 'সময়ে পেতে হলে আগে কার্ড ছাড়ুন'।

দোকানপাটের ঝলমলানি, আলোর রোশনাই এমনিতেই মারকিন দেশে সারা বছর বড়দিনি মেজাজ নিয়ে আসে। এ সময় লাগে বাড়তি পোঁচ. আলোয় আলোয় ভরে যায় সারাটা দেশ। 'সেল সেল' চিৎকার পেড়ে সব দোকানে বিক্রির ধূমও লাগে অষ্টপ্রহর।

ওই ধুমধাড়াক্কার মাঝখানে আমি কিন্তু এক শান্ত পরিবেশে ১৯৬৪ সালের বড়দিন কাটিয়েছিলাম লস এনজেলসে। ছোট্ট পরিবার—স্বামী স্ত্রী, তিন ছেলে. এক মেয়ে। পরিবারের কর্তা রয় নেলর রঙের দোকানে কাজ করেন, শান্তশিষ্ট ঘরকুনো ভদ্রলোক। স্ত্রী ম্যাকসিন চলনে বলনে ঘরকন্নায় দয়াময়ী জননী। ক্যাথি, ল্যারি, ক্রেগ, মার্ক স্কুলে পড়ে।

নতুন পরিবেশে এসে মনে হল না, আমি বিদেশী অতিথি। প্রথম সন্ধে থেকেই পরিবারের একজন হয়ে গেলাম। কনিষ্ঠ মার্ক আমাকে ডাকতে লাগল 'আমিট নেলর' বলে। একই সঙ্গে ব্রেকফাস্ট সেরে আমিও গৃহকর্তার কাজে বেরিয়ে যাই, ফিরি বিকেলে। একসঙ্গে খাওয়াদাওয়া, ঘুরে বেড়ানো, আড্ডা মারা।

প্রথম দিন বাড়িতে এসেই দেখি, সেলাই আর কেনাকাটার ধুম লেগে গেছে। ম্যাকসিনের ব্যস্ততাই বেশী, ঘরের কাজের ফাঁকে ফাঁকে চলছে উপহার কেনা, সেলাই করা, বাড়ির লোকের জন্যে

কেক, খইয়ের মোয়া তৈরী করা ; সাহায্য করেছে বড় মেয়ে ক্যাথি। ইতিমধ্যে শিকাগো থেকে এসে পড়লেন ম্যাকসিনের ছোট বোন, ভগ্নীপতি, তাঁদের গোটা পাঁচ ছেলেমেয়ে। সারা বাড়িতে হৈ-চৈ। আর এদিকে আমার মনে হচ্ছিল, যেন আশ্বিন মাসে কলকাতায় নিজের বাড়িতে বসে আছি।

ভোরবেলা স্নান সেরে নতুন জামা পরে বাড়ির সবাই গেলাম গির্জায়। সেখানে প্রার্থনার পর বন্ধু এবং আত্মীয়ের বাড়ি বাড়ি ঘোরা। লাঞ্চের আয়োজন বাড়িতে, রাত্রে ডিনারের নিমন্ত্রণ রয়ের ছোট বোনের ওখানে। কাছেই থাকেন, সেখানে রয়ের বুড়ি মা'ও রয়েছেন। আলাপ পরিচয়ের পর সবাই ড্রয়িং রুমে বসলাম জড় হয়ে। ক্রিসমাস ট্রির তলায় উপহারের প্যাকেট ছড়ানো। একে একে প্যাকেট খোলা হতে লাগল। মা দিচ্ছে ছেলেকে, ছেলে দিচ্ছে মাকে। বাবা দিচ্ছে মেয়েকে, মেয়ে দিচ্ছে বাবাকে। বোন দিচ্ছে ভাইকে, ভাই দিচ্ছে বোনকে। কেউ বাদ নেই, এমনকি, আমার জন্যেও উপহার আছে। কে কী দিচ্ছে, আগে জানা থাকে না, খোলার পর হস্তান্তর। আর প্রত্যেকবার প্যাকেট খোলার সময় সেই একই কথা—'চমৎকার জিনিস, একেবারে আমার মনের মত, ঠিক ওইটাই আমি চাইছিলাম।'

ডিনার সেরে আবার গিরজায়, আবার প্রার্থনা। সেখান থেকে বাড়িতে। এবং আবার ক্রিসমাস ট্রির তলায় বসে উপহার-বিনিময়। দশটা নাগাদ এক কাপ কফি খেয়ে সবাই তারপর দুগাড়ি বোঝাই করে দল বেঁধে ছুটলাম বেড়াতে।

ওশেন বুলেভার্দ, উইলশায়ার বুলেভার্দ ধরে একেবারে ডাউনটাউন লস এনজেলসে। গোটা শহরের তখন 'পুচ্ছটি তোর উচ্চে তুলে নাচা' ভাব, চিৎকার চেঁচামেচি হট্টগোলে কান ঝালাপালা।

এখানে ওখানে ঢু মেরে বাড়ি যখন ফিরলাম রাত তখন

আড়াইটা। সবাই ঘুমোতে যাবে, তার আগে সাত বছরের ছেলে মার্ক আমায় জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা আমিট, তোমার বাড়িতে বড়দিন কি আমাদের মত হয়?"

আমি বাড়িতে বড়দিন পালন করি না। শুনে মার্ক তো আকাশ থেকে পড়ে। বাবাকে জিজ্ঞেস করে, "সে কী করে সম্ভব?"

মার্ককে তখন বললাম, "হয় মার্ক, কিন্তু অন্য সময়, সেপটেম্বর অকটোবরে। আমরা তাকে পূজা বলি। এই সময় ঠিক তোমার বাড়ির মত আমার বাড়িতে আত্মীয়স্বজন আসে, নতুন জামা-কাপড় পরি, ভাল খাইদাই, উপহার বিনিময় হয়, আনন্দ করি।"

"তাহলে মিছে কথা বলছ কেন", মার্ক বলে—"তোমাদেরও তো দেখছি ক্রিসমাস আছে।"

নেলর-পরিবারের পর লস এনজেলসে আমার কাছে চিরস্মরণীয় ডিজনিল্যাণ্ড। সেই ছোটবেলা থেকে শুনে আসছি ওয়াল্ট ডিজনির কথা। মারকিন দেশে পা দিয়েই মনে মনে বলেছি, আর কোথাও যাই আর না যাই, ডিজনিল্যাণ্ডে যেতেই হবে।

সেই সুযোগ পেলাম লস এনজেলসে এসে। ওখান থেকে মাইল চল্লিশেক দূর। আমার বন্ধু ডীন ফাংকের পরিবারের সঙ্গে একদিন সোজা গিয়ে হাজির। ডিজনিল্যাণ্ডেরই অতিথি হয়ে।

সবাই বলে ডিজনিল্যাণ্ড, ডিজনি নিজে বলেন জাদুর জগৎ— 'দি ম্যাজিক কিংডম।' জাদুই বটে, দুশো বিঘে জমি জুড়ে ভোজবাজি, ভানুমতীর খেলা। কল্পনা সেখানে হার মানে, রূপকথা জ্যান্ত হয়, এবং অবাক হতে হতে অবাক হওয়ার কিছু থাকে না।

এই জাদুকরের নাম ওয়ালটার এলিয়াস ডিজনি, সংক্ষেপে ওয়াল্ট ডিজনি—স্কুলের গণ্ডি পার না হয়েও যিনি হারভার্ড, ইয়েলের

ডকটরেট, হাজার হাজার খেতাব-খেলাতের মালিক। মাঝারি লম্বা গড়ন, অস্থির দীর্ঘ হাত এবং অসাধারণ দুটি চোখ। জন্ম শিকাগোয়, বাল্যে কাজ করেছেন মিজোরার খামারে, নকল করতেন পশু-পাখির গলা। হঠাৎ একদিন খুলে বসলেন স্টুডিও—কালিফরনিয়ার বুর-ব্যাঙ্কে। শুরু হল কারটুন ছবি, জন্ম নিল মিকিমাউস। গোড়ায় নাম দিয়েছিলেন মর্টিমার। একদা স্টুডিও কর্মী, পরে স্ত্রী লিলিয়ান বললেন—না, নাম দাও মিকিমাউস। সেই নামই আনল জগৎজোড়া খ্যাতি। এল ডোনাল্ড ডাক, তৈরী হতে থাকল হাজার হাজার কারটুন, সিনেমা, ন্যাচার ফিল্ম, গানের রেকর্ড, বই ছাপা, কমিক স্ট্রিপস, টি-ভি পিকচার্স। আয়ের অঙ্ক বাড়তে বাড়তে দাঁড়াল বছরে পঁয়ষট্টি কোটি টাকা।

নিজে কোন ছবি আঁকেন না, কিন্তু সব কিছুতেই থাকে 'ডিজনি-টাচ।' স্টুডিওতে থাকেন সকাল সাড়ে আটটা থেকে রাত আটটা। ছুটি নেননি কোনদিন। ভাই রয় ম্যানেজার, স্ত্রী গল্প বাছাই করেন। আর আছে কয়েক হাজার শিল্পী। সব দিকেই তাঁর নজর, সব শিল্পীই জানতে চায়—'হাউ ডাজ ওয়াল্ট লাইক ইট?'

ডিজনিল্যাণ্ড গড়ার স্বপ্ন ১৯৩০ সাল থেকে। দুই মেয়েকে নিয়ে গিয়েছিলেন এক অ্যামিউজমেণ্ট পার্কে, ফিরে এলেন বিরক্ত হয়ে। বললেন, ওগুলো পার্কই না—'ডার্টি ফোনী প্লেসেস, রান বাই টাফ-লুকিং পিপল।' লস এনজেলস থেকে মাইল তিরিশেক দূরে আনাহাইমে অবশেষে ১৯৫৫ সালের ১৮ জুলাই তাঁর স্বপ্ন রূপ নিল। পত্তন হল ডিজনিল্যাণ্ডের। সব মিলিয়ে মোট ১৭০ একর জায়গা। গোড়াতেই খরচ সতের মিলিয়ন ডলার, প্রায় তের কোটি টাকা। তাছাড়া এযাবৎ মোট ঢালা হয়েছে আরও চল্লিশ কোটি টাকা। বছরে লোক দেখতে আসে ৬০ লাখ। সকাল সন্ধ্যে সেখানে কাজ করছেন সাড়ে চার হাজার কর্মী। নিজের মেয়ের

মত ভালবাসতেন ডিজনি এই জায়গাটিকে। ওইখানেই তাঁর থাকার ঘর। ওইখানেই তাঁর সব।

ঠিক দু বছর আগে, বড়দিনের আগে আগে গিয়েছিলাম সেই 'জাদুর জগৎ' দেখতে। সানটা মনিকা থেকে আমার বন্ধু ডীন ফাংক আর তাঁর তিন ছেলের সঙ্গে। আমরা সবাই খোদ ডিজনির অতিথি, তাই অবারিত দ্বার। এবং সকাল নটায় দরজা পেরোতেই চিচিং ফাঁক।

মনে মনে নয়, দেখে দেখে রূপকথার রাজ্যে হারিয়ে যাবার মানা এখানে নেই, সটান গিয়ে হাজির নয়া কলোনি পুরনো আমেরিকায়। আদ্যিকালের রাস্তাঘাট, দোকানপাট, পসরা, পোশাক। খানিক আগে ছেড়েছি চোখ-ধাঁধানো লস এনজেলস, এ জগৎ একদম আলাদা। ঘোড়ার গাড়ির ঠুংঠং, ধরন ধারণ জবড়জং।

খানিক এগোতেই চক্ষুস্থির, এ বলে আমায় দেখ, ও বলে আমায়। এই প্রথম টের পেলাম দু চোখই যথেষ্ট নয়, ডিজনিল্যাণ্ডে হওয়া চাই সহস্রলোচন। আকাশে উড়ছে হাতি, জলে নামছে সাবমেরিন, চক্কর মারছে মনোরেল, ঘুরে বেড়াচ্ছে জন্তু জানোয়ার। এবং মাথা তুলে সামনেই দাঁড়িয়ে আছে ঘুম-পরির বাড়ি—স্লিপিং বিউটি কাস্‌ল।

ফাংক বললে, একদিনে সব দেখা অসম্ভব, বাছাই করতে হবে। গোড়ায় চল অ্যাডভেনচার ল্যাণ্ডে। তারপর পুরোনো কলামবিয়া জাহাজ চড়ে টম সায়ার্স আইল্যাণ্ড, সাবমেরিনে সমুদ্রের তলায়, ঘুম-পরির দেশে, মনোরেলে। সেখান থেকে ফ্রনটিয়ার ল্যাণ্ড, টুমরো ল্যাণ্ড, ফ্যানটাসি ল্যাণ্ড। এবং টিকি রুম।

গাইড দেখিয়ে দিল বাঁদিকের রাস্তা। হঠাৎ পেলাম বুনো গন্ধ। ঝোপঝাড়, বন বাদাড়ে সত্যিকারের অ্যাডভেনচারের জায়গা-জঙ্গলের মাঝখান দিয়ে বয়ে চলেছে পাহাড়ী নদী, তার কোলে

দাঁড়িয়ে আছে স্পীডবোট। বোট ছুটতেই পলকে পলকে পালাবদল। আমরা কখনও তাইল্যাণ্ডের ভিতরে, কখনও কঙ্গোর গভীর অরণ্যে। বিদ্যুৎবেগে ছুটে আসছে পাগলা হাতি। বোটের ঠিক সামনে, কী সর্বনাশ! মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে হিপোপটেমাস। ক্যাংকের সাত বছরের ছেলে আমাকে জড়িয়ে ধরেছে ভয়ে। গেল গেল, নৌকো বুঝি ডুবল। না, কোনক্রমে সে যাত্রা প্রাণ বাঁচল। নদীর পাড়ে ছুটে এসেছেন সেই মুহূর্তে এক শিকারী। অব্যর্থ তাঁর লক্ষ্য, হিপ্পো গুলিবিদ্ধ, হাতি পলাতক।

খানিক বাদে "হুই-হাই" চিৎকার, আমরা আফরিকায়। সেখানে ধুনি জ্বালিয়ে গোল হয়ে নাচছে নিগরোর দল। এমন সময় ঠিক আমাদের বোটের কোল ঘেঁষে বনবাদাড় কাঁপিয়ে একরোখা এক গণ্ডার তীর বেগে তাড়া করল নাচিয়েদের। ভয়ে আমরা কাঠ, ওরা ছুটল এক গাছের দিকে। সড় সড় উঠে পড়ল একের পর এক, গণ্ডার ততক্ষণে পগার পার।

আধ ঘণ্টার সফর, আঠারশ সেকেনডের রুদ্ধশ্বাস অভিজ্ঞতা। বোট থেকে নামতে নামতে ডীনকে বললাম, কী করে এই অসম্ভব সম্ভব। ডীন বলল—সব নকল, সব যন্ত্রে চলে।

অতঃপর সাবমেরিন যাত্রা। জলে ডুব দিলাম সবার সঙ্গে। নামল বোধ হয় তিন কি চার ফুট, মনে হল কয়েক হাজার ফুট নীচে নেমে গিয়েছি। আর সেখানে অতল সাগরের অতল রহস্য চারধারে ছড়ানো! কাচের বড় বড় জানালা দিয়ে সব দেখছি। অকটোপাস আসছে, তিমি ঝাপটা মারছে. রত্নদ্বীপে জ্বলজ্বল করছে মণিমুক্তা, নাম-না-জানা কত রকমের সামুদ্রিক জীব দশ মিনিট মাত্র সময়, কিন্তু উপরের ডাঙায় যখন আবার পা দিলাম, মনে হল দশ কোটি যোজন পার হয়ে এসেছি।

আবার মেইন স্ট্রীটে, ১৯০০ সালের আমেরিকায়। এপাশে

পাগলা পেয়ালা, ওপাশে আইসক্রীম পারলার এবং তারই লাগোয়া সানতা কে অ্যাণ্ড ডিজিনিল্যাণ্ড রেলরোড। রেল চড়ে পার হয়ে এলাম গ্র্যাণ্ড ক্যানিয়ন, রেড ইণ্ডিয়ানদের আস্তানা, প্রকৃতির নানা বিস্ময়—কত রকমের জীবজন্তু, পাখি, গাছপালা।

ফ্যানটাসিল্যাণ্ডে অন্য জগৎ। ছেলেবেলায় শোনা নানা রকমের রূপকথা সেখানে বাস্তব হয়ে ঘুরে বেড়ায়। ওইতো তুষারকন্যা স্নো হোআইট, ঘন বনের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে এল। সে-ই আমাকে নিয়ে গেল সাত বামনের কাছে। তারপর কোথায় গেল সেই তুষারকন্যা আর কোথায় গেল সেই সাত বামন, আমি তখন ক্যাপ্টেন হুকের হাত থেকে পালানো পিটার প্যানের সঙ্গে ছুটছি। পিটার প্যান উধাও, এবার আমি কখনও এলিসের সঙ্গে আজব দেশে কখনও সিনডেরেলার স্বপ্নাবাসে, কখনও বা প্লিনোককিওর গাঁয়ে।

দেখতে দেখতে বেলা দুপুর। দোকান থেকে খাবার কিনে খেয়ে আবার এক রূপকথার জগতে—ফ্রনটিয়ার ল্যাণ্ডে। সেখানে রয়েছে শ দুয়েক নকল পশু-পাখি—ঘুরছে ফিরছে লড়ছে—পৃথিবীর সেই আদিম যৌবনের সকল তাড়না নিয়ে। ধীরে ধীরে সভ্যতার বিকাশ অতীত আমেরিকার নদী-নালা বেয়ে বেয়ে মার্ক টোয়াইনের দেশে, রেড ইনডিয়ানদের পাড়ায় এবং আবার টম সায়ারের দ্বীপে।

টুমরো ল্যাণ্ডে ভবিষ্যতের ছবি। সেখানে বিজ্ঞান আর কারিগর রাখবার। মনোরেলে চক্কর, ফ্লাইং সসারের পাইলট হয়ে উত্থান পতন পালা এবং রকেটে চড়ে মহাকাশে পাড়ি।

হাতে সময় আট ঘণ্টা, তার মধ্যে কাবার ছয়, সব দেখার সাধ মেটে না, অগত্যা চলি ডিজনিল্যাণ্ডের নতুন আকর্ষণ 'টিকি রুমে।' এবং আমরা মুহূর্তে হাওয়াই দ্বীপে। সেখানে ফুল গান গায়, বাঁশঝাড় অরকেস্ট্রা বাজায়, অরকিডের সার তালি লাগায়।

ঢুকতেই নকল টিয়াপাখি টেপরেকর্ড করা গলায় স্বাগত জানাল,

চেয়ারে বসতেই খিল খিল হেসে উঠল আর একটা পাখি, নানা কোণ থেকে নানা রকম কথাবার্তা। তারপরেই পাখি আর ফুলের গানবাজনা। সাংঘাতিক সব ব্যাপার।

বিকেল চারটায় ক্রিসমাস প্যারেড, বড়দিনের বড় আকর্ষণ। ডিজনিল্যাণ্ড ব্যাণ্ড মনমাতানো বাজনা ততক্ষণে শুরু করে দিয়েছে ফুলের বাগানে, গাছের আড়ালে। আমরা সবাই লাইন বেঁধে বসে পড়লাম। মেইন স্ট্রীটের ফুটপাতে। সবার হাতে পপকর্নের ঠোঙা।

প্রথম ব্যাণ্ডের মিছিল। তারপর নানা ধরনের, নানা পোশাকের মানুষ-পুতুল। এল পাগলা-মোটর। মাতালের মত টলতে টলতে চলে, চলতে চলতে টলে। এগোয়, পিছোয়, ল্যাম্পপোস্টে ঢু মারে। ডীনের ছেলেরা হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ে, আমার চোখ কপালে ওঠে।

প্যারেড শেষ, আমাদেরও এবার ফেরার পালা। বাইরে বেরিয়ে ঘোর কাটে না, ফিরে পাওয়া ছেলেবেলা সঙ্গ ছাড়ে না।

ছেলেবেলার কথা ভাবতে ভাবতে দেশের কথা, বাড়ির কথা মনে পড়ে গেল।

ডীন বললে—এত আনমনা কেন ?

বললেন—জীবনে এই প্রথম বড় অপরাধ মনে হচ্ছে নিজেকে, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজনকে বাদ দিয়ে এমন জিনিস একা কেন দেখলাম ? এ দেখায় সখ মিটেছে, সুখ পাইনি।

॥ তিন ॥

নিউইয়র্কে গিয়েছি ক'বার? কমসে কম পাঁচবার, তবু এই শহরটা ঠিকমত চেনা হল না। বোধহয় পাঁচ বছর থাকলেও হবে না।

হবেই বা কী করে, ছিলাম টাইম স্কোয়ারের লাগোয়া ফোর্টি নাইনথ স্ট্রীট আর সেভেনথ এভিনিউয়ের মোড়ে, ব্রিস্টল হোটেলে। অষ্টপ্রহর সেখানে কাম-সংকীর্তন চলছে। রাতের কথা বাদ দিলাম, সকাল নেই, দুপুর নেই, ছুঁক-ছুঁক-করা বাজে মেয়ের দল ঘুরে বেড়াচ্ছে। একবার ওদের পাল্লায় পড়লে খেল খতম।

হোটেলের লাউনজে বসে আছি। লিফটের পাশের সোফায়। হঠাৎ দেখি, চার পাঁচটি 'টীন-এজার' মেয়ে খিলখিল হাসতে হাসতে ভিতরে এসে ঢুকছে। রিসেপশন-কাউনটারের পাশ দিয়ে এগিয়ে আমার সামনে এসে দাঁড়াল। তারপর লিফটের বোতামে হাত। লিফট নামল। ওরা উঠতে যাবে, এমন সময় রেসিপশনের একজন লোক এসে প্রশ্ন করল—"হেই মেয়েরা, তোমরা কোথায় কার কাছে যাচ্ছ?"

একটি মেয়ের সপ্রতিভ উত্তর—"আমাদের এক বন্ধুর কাছে।"

—"বন্ধু? কত নম্বর ঘর?"

—"পাঁচশো তিন।"

পাঁচশো তিন! কী সর্বনাশ, এ যে আমার ঘরের নম্বর। মিথ্যেবাদী মেয়েগুলো তো দেখছি পাজির পাঝাড়া।

সেই ভদ্রলোকের কেমন যেন সন্দেহ হল। নাম জানতে চাইলেন ওদের বন্ধুর।

কেউ জবাব দিল না। তার বদলে লিফট ছেড়ে হুড়মুড় করে দে ছুট—একেবারে হোটেলের বাইরে ফুটপাতে।

জানি না, কী মতলব ছিল মেয়েগুলোর মনে। নিশ্চয়ই কোন বদ মতলবে অন্য কারও ঘরে ঢুকতে চেয়েছিল। হঠাৎ একটি নাম বলতে গিয়ে বেফাঁস এমন নম্বর বলে দিল, যা আকস্মিকভাবে আমারই ঘরের নম্বর।

এ জাতীয় মেয়েদের উৎপাত আমেরিকার হোটেলগুলোয় তো নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। ইউরোপের হোটেলগুলো অন্য রকম। সেখানে রিসেপশনে নামধাম পরিচয় ইত্যাদি না দিয়ে ভিতরে কারও ঘরে ঢোকা কঠিন। আমেরিকায় তার উলটো। হরদম মেয়েরা ঢুকছে, বেরোচ্ছে, আর বেলেল্লাপনা চলছে অনবরত। সেদিন নিউইয়র্কের ওই ঘটনায় মেয়েগুলো নাবালিকা ছিল বলেই রিসেপশন থেকে আপত্তি উঠেছিল, নইলে কে কার খোঁজ রাখে।

অন্যে পরে কা কথা. ব্লুমিংটনে ইণ্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ের গেস্ট-হাউস ইউনিয়ন মেমোরিয়েল বিল্ডিংসে যখন ছিলাম, তখনই দেখেছি বিশ্ববিদ্যালয়ের জনা কয় ছাত্রী কী ভাবে রাতের পর রাত নতুন চেনা বিদেশী অতিথির সঙ্গে এক ঘরে থেকে যাচ্ছে। ভোরবেলা ওখান থেকেই সোজা চলে যাচ্ছে ক্লাশে। অদ্ভুত ব্যাপার!

এই ধরনের কাণ্ডকারখানার পরিচয় গোড়াতেই পাই, ওয়াশিংটনে নেমেই। আছি উইণ্ডসর পার্ক হোটেলে। বেরিয়ে ঘরে ফিরছি সন্ধেবেলা। আমার সঙ্গে লাওসের সাংবাদিক চন্দ্ররাজ, দুজনে কাছাকাছি ঘরে থাকি। দূর থেকেই আমরা দেখি, নিশ্চল লিফটের ভিতরে একটি মোটাসোটা নিগরো মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমরা ঢুকতেই আমাদের দিকে চেয়ে মেয়েটি মুচকি মুচকি হাসছে।

লিফট চলতে শুরু করল। আমরা উঠব সাত তলায়। মেয়েটির মৃদু হাসি দেখে চন্দ্ররাজের মনে হল, বুঝি কিছু বলতে চায়। বেচারা

যেই জিজ্ঞেস করল, 'আপনি এই হোটেলেই থাকেন নাকি,' দেখি মেয়েটির চোখেমুখে "ভাব" উথলে পড়ছে। একগাল হেসে জবাব দিল—"তোমরা আমার সঙ্গে গল্প করতে চাও নাকি? যদি চাও তো এসো।"

এবারে টের পেলাম। বুঝলাম গতিক সুবিধের নয়। লিফট থামতেই দুজনে ঘরের দিকে ছুটলাম। একবার পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখি, লিফটের কাছেই মেয়েটি একদৃষ্টে আমাদের ছুটে পালানোর দিকে তাকিয়ে আছে।

ঘরে ঢুকেই খিল। কিন্তু মারে কৃষ্ণ রাখে কে, খানিকবাদেই দরজায় ঠক ঠক। দরজা খুলতেই ভিরমি খাবার যোগাড়। সেই মেয়েটি হাজির। দড়াম করে দরজা বন্ধ করে আমি ভয়ে কাঠ।

পরদিন ভোরে চন্দ্ররাজ এসে বলছে, ভাই, কাল রাতে যা কাণ্ড হয়ে গেল। লিফটে-দেখা সেই মেয়েটি আমার দরজায় ধাক্কা দিতেই যেই দরজা খুলেছি, ঘরে ঢোকার জন্যে কী কাকুতিমিনতি! বলে, 'টাকার জন্যে ভেব না, যা হয় পরে দিও, একবারটি ঢুকতে দাও।' আমি কিছুতেই দরজা খুলব না, ও কিছুতেই দরজা ছাড়বে না, দুজনে শেষপর্যন্ত ধস্তাধস্তি। কিন্তু নিগরোর সঙ্গে পারব কী করে, মেয়েটি ঢুকেই পড়ল। তখন আমি কী করি, প্রাণের ভয়ে লিফটে নিচে নেমে রিসেপসনে খবর দিই। ওরা এসে মেয়েটিকে তাড়ায়। সারারাত ঘুমোই নি। উঃ, কী সাংঘাতিক অভিজ্ঞতা!

চন্দ্ররাজের অভিজ্ঞতার কিঞ্চিৎ অংশীদার আমিও। দুজনে খুব বেঁচে গিয়েছি। বলা যায় না, ওই সব মেয়েদের পেছন পেছন নিশ্চয়ই গুণ্ডার দল থাকে, কোথায় কখন কী করে বসে কে জানে।

তবে আশ্চর্যের ব্যাপার, হোটেলের লোকেরা কিন্তু এ নিয়ে তেমন মাথা ঘামাল না। বলল, ও কিছু না, এসব হামেশাই হয়ে থাকে।

হামেশা যে হয়ে থাকে তার আর একটি দৃষ্টান্ত আছে শিকাগোর। সেও সেই হোটেলের ব্যাপার।

সেণ্ট ক্লেয়ার হোটেল। আমাদেরই দলের দুটি ছেলের সঙ্গে—একজন কোরিয়ার, একজন নেপালের—শিকাগোর নাইট-লাইফ দেখতে বেরিয়েছি। রাত বারটার মধ্যে তিনটে নাইটক্লাব সেরে ট্যাকসিতে যখন হোটেলে ফিরছি, কোরিয়া এবং নেপাল দুজনেই বলল, "এখন ফিরব না, আরও কিছু দেখে যেতে চাই।"

"আরও কিছু মানে?—আমার প্রশ্ন।

"এই মেয়ে-টেয়ে আর কি,"—কোরিয়ার নির্লিপ্ত উত্তর।

আমি বললুম, "না ভাই, আমার প্রাণের ভয়, মানের ভয় দুটোই আছে, আমাকে হোটেলে নামিয়ে দিয়ে তোমরা যেখানে খুশি যাও। আর ভায়ারা, মনে রাখবে শহরটার নাম শিকাগো, দয়া করে একটু সাবধানে থেকো।"

আমি হোটেলে নেমে গেলাম। ওঁরা আবার জোরসে ট্যাকসি হাঁকাল। আপাতত ওদের ফ্রেণ্ড ফিলজফার অ্যাণ্ড গাইড ট্যাকসিরই ড্রাইভার।

হোটেলে ফিরে দেখি, তখনও হোটেলের লাগোয়া বারে নরক গুলজার। সিগারেটের ধোঁয়া, মদের গন্ধ, কড়া বাজনা আর যুবকযুবতীর খিলখিল হাসিতে গোটা ঘর গমগমাট। ওদিকে লাউঞ্জেও মেয়েতে ছেলেতে ঢলাঢলি।

আমি থাকি একুশ তলায়। আমার রুমমেট কোরিয়ার সেই সঙ্গীটি। লিফটে ছুটলাম সোজা নিজের ঘরে।

জামাকাপড় পালটে শুয়ে পড়লাম। পরদিন সকালেই হোটেল ছাড়তে হবে, তাই টানা ঘুম চাই। ও হরি, হঠাৎ দরজায় ঠক ঠক এবং দরজা খুলে কোরিয়া হাজির। একটি চাবি ওর কাছে। ধড়মড় করে উঠে তাকিয়ে দেখি ঘড়িতে তখন আড়াইটা।

কোরিয়া ফিসফিস করে বলে, "এ-ই, একটা মেয়ে নিয়ে এসেছি।"

"দূ-র যত্তসব বাজে কথা"—আমি অবিশ্বাসের সঙ্গে বলি।

কোরিয়া জবাব দেয়—"না, বাজে কথা নয়, বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। অনেক ঘুরে, শেষমেষ ওকেই পেলাম একটা রেসতোরাঁয়। শুক্রবারের রাত, উইক এণ্ডের রাত, ট্যাকসি ড্রাইভার বলল, এত দেরিতে পাওয়া মুশকিল। যাই হোক, পেয়ে তো গেলাম। যাই, মেয়েটিকে ডেকে নিয়ে আসি।"

মুহূর্তে কোরিয়া ও নেপাল দুই মূর্তিমান উপস্থিত, পিছনে একজন বিদেশিনী মূর্তিমতা। আমি অপ্রস্তুত, জামাকাপড় সামলে ভদ্রস্থ হবার চেষ্টা করি। মেয়েটি কিন্তু সপ্রতিভ। আমার সঙ্গেও কথা বলতে শুরু করে দিল সামনের সোফায় বসে। হঠাৎ কোরিয়াকে মেয়েটি জিজ্ঞেস করে, "এই ভদ্রলোকও কি ঘরে থাকবেন বাকি রাত, তাহলে কিন্তু বাড়তি টাকা দিতে হবে।"

আমি বলি, "না, আমার টাকা নেই, দরকারও নেই।"

দরকার না হয় নেই, কিন্তু সমস্যা. এখন ঘর ছাড়লে যাবটা কোথায়? বাইরে করিডরে দাঁড়িয়ে থাকলে তো চলবে না।

নেপাল বলল, "আচ্ছা অমিত, ততক্ষণ তুমি বাথরুমে থাকলেই তো পার।"

কোরিয়া : বাঃ রে, তা কী করে হয়। আমাদের দুজনের মধ্যে একজন যখন ঘরে থাকবে, অন্য জন থাকবে বাথরুমে!

"কে আগে অপেক্ষা করবে বাথরুমে—"

নেপাল জানতে চায়।

কোরিয়া সহজে তার সমাধান করে দিয়ে বলে, "সেটা টসে ঠিক হবে।"

ধুৎতেরি টস, ওরা আছে নিজের চিন্তায়, আমার কী হবে এখন? ওদিকে আমার হাবভাব দেখে মেয়েটি মুচকি মুচকি হাসছে।

সবাই যখন অপাঙ্‌ক্তেয় এই চতুর্থ ব্যক্তিটিকে নিয়ে গভীর চিন্তায় মগ্ন, তখন মেয়েটিই সব সমস্যার সমাধান করে দিল। বলল, "এই ঘরে দিস জেণ্টলম্যান ছাড়া আর কে থাকে ?"

"আমি—"কোরিয়ার উত্তর।

"অ্যাণ্ড ইউ ডারলিং"—নেপালকে দেখিয়ে মেয়েটির ফের প্রশ্ন।

"আমি থাকি সতের তলায়, ১৭২১ নম্বর ঘরে, আমার রুমমেট ভিয়েৎনামী একজন",—নেপালের উত্তর।

"ব্যস, প্রবলেম সলভড"—আমার দিকে তাকিয়ে মেয়েটি বলে, "যদি সাধু সেজে থাকতে চাও তবে ওর কাছ থেকে চাবিটা নিয়ে ১৭২১ নম্বর ঘরে চলে যাও, বাকি রাতটা ওখানেই কাটাও। আর যদি আমাকে নিয়ে অন্য কোন প্লান থাকে তাহলে খবর দিও, আমি তো—"

মেয়েটির কথা শেষ হওয়ার আগে আমি চাবি হাতে বেরিয়ে পড়ি, রাত তিনটায় ভিয়েতনামীর ঘুম ভাঙিয়ে নেপালের বিছানায় শুয়ে পড়ি।

বাকি রাত অবশ্য ঘুম হয় নি। একুশ তলায় আমার ঘরে ওই তিনজনেরও যে জাগরণেই কেটেছে, সেকথা আশা করি বলে দেবার দরকার নেই। তবে একটা প্রশ্ন, টসে জিতল কে ?